মায়ার সংসার

বলাইচন্দ্র ভৌমিক

পরিবেশক
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রী দুলালচন্দ্র জানা
জানা লাইব্রেরী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ মহালয়া, ১৩৭০

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ
শ্রী গৌরচন্দ্র জানা
আদ্যাশক্তি প্রিণ্টার্স
২৪৩/২সি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

আমার করুণাময়ী জননী

শ্রীমত্যা চারুবালা ভৌমিকের শ্রীচরণে—

ভূমিকা

আমি গ্রামের ছেলে। গ্রামীণ পটভূমিকায় যে সমস্ত মানুষ দেখেছি, চিনেছি, জেনেছি তাদের নিয়েই এই উপন্যাসের উপাদন। কোথাও কল্পনার জাল বুনিনি। ভাষা ও চরিত্রের মধ্যে কোথাও রঙ চড়াইনি। যে যেমন মানুষ, তাকে ততটুকুই এঁকেছি, দেখিয়েছি, কথা বলিয়েছি। চরিত্র-চিত্রণে মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। অকপটে এই সত্যটুকু পাঠক-পাঠিকার কাছে সবিনয়ে বলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আদ্যাশক্তি প্রিণ্টার্সের মালিক ও সকল স্তরের কর্মচারিগণকে—যাঁরা শ্রম ও সহানুভূতি দিয়ে এই উপন্যাস ঠিক সময়ে প্রকাশে সহায়তা করেছেন।

উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্রগুলি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যদি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত—

গ্রন্থকার

॥ এক ॥

জগৎ মালিকের বড় মেয়ে, মায়াকে যে দেখেছে কিংবা তার জীবনী শুনেছে, সে-ই মায়ায় মরেছে। কিন্তু মায়া মরেনি। মায়া যত কঠিন, তত নরম। মেয়েদের এই পরিচয়টা স্বামীর ঘরে সম্ভব, না নিজের হাতে গড়া ঘর বলে সম্ভব হয়েছিল—এ শুধু মায়াই বলতে পারে।

মায়াই সকলের বড়। তার কোলে আরও তিন ভাই ও তিন বোন। কোলের ছোট ভাইটি মায়ের বুকের দুধ খায়—সেই সবেমাত্র হামা দিতে শিখেছে। মায়ার বিয়ে হয়ে গেল। জগুর নিত্য নেশা। না করলেও জ্ঞাতিভাইদের কাছে সে অপাংক্তেয়। কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে মায়ার মা তিতিবিরক্ত। বিয়ের দিন জগৎ সকাল থেকেই নেশায় চুর। বিয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়েছে তার মামা।

বিয়ে হয়ে গেল মায়ার। আজ সে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর ঘর যাবে। অনেকে সাজাচ্ছে মাসী ও পড়শী দিদিরা। মাসী মায়ার কানে বলে দিল, মায়া, বরকে নিয়ে বাবাকে গড় করিস মা।

মায়া বর কুমুদের সঙ্গে জগুকে গিয়ে সাস্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করতেই, শিবু জ্যাঠা বলল হ্যাঁরে জগু তোর মেয়ে বেশ সেজেছে। আমরা বলতুম ওকে সাজালে পুতুল বউ হবে। কিন্তু বাইরে। বলে শিবু মায়ার কাছে দাঁড়াল। মনে হল মেপে দেখছে এখন তাকে কত বড় দেখাচ্ছে। তারপর বলল—বা, বা, কাপড়ে-চোপড়ে বেটী, বেশ বউ সেজেছে। যাও জামাই সুখে ঘরকন্না করগে।

জগৎ নেশার ঘোরে বলল, খাইয়েছি, পরিয়েছি কি এমনিরে শিবুদা। মা আমার কৈলাসে চলল। কিন্তু মহামায়াকে কি রাখতে পেরেছে শিবু, বলেই জগৎ নেশার ঘোরে কেঁদে ফেলল। আ…হা…হা এবার কে আমাকে বকাঝকা করবে। কে আমার মাথায় জল দিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাতে বসাবে। নারে শিবুদা না, মা আমার সবার মা, বর কুমুদ শ্বশুরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে এল। বয়েস তার অল্প, কিন্তু সে তার দু-দিদিকে কণে সেজে বরের সঙ্গে যেতে দেখেছে কিন্তু এমন দৃশ্য দেখেনি। ভাবল, ও শ্বশুরের নেশার মুখ।

জগুর স্ত্রী-সাবিত্রী সেদিন লাউ মাচাটা সোজা করছিল। মুখে কিছু বলেনি, মনে মনে তার খুবই রাগ। বিয়ের দিন শাক কেটে গাছটার পদার্থ কিছু রাখেনি। এমন কি ডালা-ডোগলাগুলোও চারদিকে ছতিছন্ন। জগু হাঁকল ওরে রাগ করিসনি, পাঁচ হাতের কাজ, পালিয়ে আয়। আমি আবার মাচা তৈরি করে দেব। লাউ হবে, মেয়ে জামাই এলে আবার শাক খাবে। পিঠে হবে, পুরতে দিবি উমার ঘর থেকে দুধ আনব লাউ দুধও হবে।

সাবিত্রী বলল মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে যে সেই ভাল, আবার বলে লাউ হবে। এস না, আমার হাত কেটে, ঠ্যাং ভেঙ্গে মচকে ফেলে রেখে ডাকবে ওগো ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

জগু বলল মেয়ে মানুষের কঁ্যাথায় আগুন। নে-তুই যা ইচ্ছা কর।

সাবিত্রী গোঁ-ভরে নুয়ে পড়া মাচাটা গায়ের জোরে যেই সোজা করতে গেল, অমনি গোড়া মোটা পাড় বাঁশটা সজোরে মাথায় এসে পড়ল। সে মাটিতে পড়ে গেল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল—জগুদা, বৌদি মাচা নিয়ে ধপাস। ছুটে এস।

সাবিত্রী রসিক মুখের জন্য পাড়ার দেওররা বেশ পিছু লাগত। আজ তারা ছুটে এসে দেখল, সাবিত্রীর নাকে রক্ত, কোন নড়ন চড়ন নাই। তারা গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলল—বৌদি, দাদা মদ আনতে পাঠাচ্ছে, আর আমাদের এই মাচাটাই বেঁধে খাট তৈরি করতে বলছে—কই তুমি যে মত দিচ্ছ না। কিন্তু হঠাৎ গল গল করে নাক বেয়ে রক্ত ঝরতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল জগুদা শিগ্গির এস, বৌদি অজ্ঞান। নাক দিয়ে যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! জগু চেঁচিয়ে বলল, যারা কারো কথা নেয় না, তারা অজ্ঞান কেন, মরলেও কিছু যায় আসে না। গুরুজনের কথা না শোনা যে পাপ! তাতো জানে না। নে, ঘরে দেবতা থাকতে, যা ঠাকুরস্হান। এবং সামনে শিবুর স্ত্রী মালতীকে দৌড়ে যেতে দেখে বলল মন্দির গো মন্দির—দে···বা···ল···য়!

কিন্তু মালতী গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, পতি দেবতা! বলি আজ যা বোতল টেনেছ? কথাগুলো কানে যাচ্ছে? মেয়েটা অজ্ঞান। নাক দিয়ে পাঁঠা কাটার মত রক্তের স্রোত বইছে! উনি নেশা করবেন, আর মুখ করা, জ্ঞান দেওয়া পাপ! তারপর বলল, ও-বলেই বলেনি। অন্য মেয়ে হলে, এত দিন বলে দিত আর একটাত ধরেছ, এটা আর ভাল লাগবে কেন? মর মিনসে, আগে মর।

ওদিক থেকে শিবু ছুটে এসে হাঁকল শালার কি কান নাই। তারপর ছোকরাদের বলল-ছুট বাবলু মালের ঘর, সে যত টাকা ভাড়া নেয় নিক, তার ট্রলিটা নিয়ে আয় বৌমাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তারপর হাঁকল এই শালা, নেশা ছুটেছে!—ঘর সামলা, আমরা এই হাসপাতাল চললুম।

জগু এসে দেখে বলল—এঁ্যা, একি কাণ্ড! তারপর মালতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল বৌদি, তুমিই নাই থাক, আমি সঙ্গে যাই।

মালতী বলল কোলের কাঁচ ছেলেটা আমার কাছে থাকবে কেন? জগু বলল, আমার কাছেই বা থাকবে কেন? পেট খ্যালি হলেই কাঁদবে।

ইতিমধ্যে মায়া ও কুমুদ এসে হাজির হোল। তারা বাড়ীতে গোলমাল শুনে এক রকম দৌড়েই এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মালতী বলল ঐ তো ওর বাহন এসে গেছে। নে মা-নে, ভাই তোর কোল পায় নিতো ক-দিন কেঁদে গগন ফাটাচ্ছে।

মায়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, না জ্যেঠি, আমি মায়ের সঙ্গে হাসপাতাল যাবো।

মালতী বলল, বিয়ের পর এই প্রথম বাপের বাড়ী এলি, তারপর জামাই ছেলে পয়লা শ্বশুর ঘর এলো। যদি মা ভাল থাকতো, তবে তোকে আমি যেতে না করতুমনি। মায়া মালতীর বুক জড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জ্যেঠি!

মালতী হুয়া হুয়া করা ভাইকে মায়ার কোলে দিয়ে বলল, এইতো কালু এবার চুপ, বাহন তোর, না-রে?

মায়া মালতীর বুক ছেড়ে ভাইকে কোলে নিল। কালু দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ট্রলি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে হাসপাতাল চলল।

কুমুদ মায়াকে বলল আমি এখন যাই, তুমি তখন যেও।

মালতী বলল, তুমি যে এখনও মুখে জল দাও নি।

কুমুদ বলল, ফিরে আসি তারপর দেখা যাবে।

॥ দুই ॥

হাসপাতালে তেরদিন কাটিয়ে সাবিত্রী ঘরে ফিরে এসেছে ও রোদে শুয়ে আছে। ডান পাশে কালু ঘুমাচ্ছে। বাঁয়ে মায়া মায়ের হাড়জিরজিরে

শরীরের দিকে লক্ষ্য করে কাঁদছিল। সাবিত্রীর কথা বলা নিষেধ। তথাপি মেয়েকে বলল তিনদিন কিছুই জানিনি। হঠাৎ চোখ খুলেই দেখি, আমি হাসপাতালে শুয়ে আছি। হাত-পা বাঁধা, তখনও সেলাইন চলছে। পাশে গের-গুষ্টি সব দাঁড়িয়ে। শুধু তুই-ই নাই। কথা বলার চেষ্টা করলুম, কিন্তু দেখি ভিতর থেকে জিভ টেনে নিচ্ছে, গলা শুকনো কাঠ। আস্তে গলায় সাড়া দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তাও কি পারি। মাথার পাশে তোর মাসী বসেছিল, জল দিল দু-ঘোঁট খেলুম। এত-ক্ষণে আমার জীবন বলে মনে হোল। তারপর মায়ার হাত ধরে বলল মা, তুই বুঝি খুব কাঁদতিস! তাই তোকে কেউ হাসপাতালে ঢুকতে দেয়নি? কথা শেষ করেই মায়াকে জড়িয়ে ধরল।

আঃ, তোমার নড়া চড়া, কথা বলা যে নিষেধ! চুপ চাপ থাকো, আবার কি বলতে কি হয়ে বসবে। বলেই মায়া মাকে বালিশে মাথা রেখে শুইয়ে দিল।

সাবিত্রী বলল ওঃ, জেলখানারে, জেলখানা!—নার্সদের কি ব্যবহার! কাপড় চোপড়ে মা-ই, আর অন্তরে অন্তরে ওরা ডাইনির কিছু কম নয়।

বলা নাই কওয়া নাই, দেখি, বলেই প্যাঁক করে ইনজেকশনের ছুঁচটা ফুটিয়ে দিলে। কিছু বল, মুখ ভঙ্গি, হাত পা ছোঁড়া দেখলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। বলতে কি জানিস মা, ঝাঁপিতে ভরে রাখা দুধ কলা খাওয়ানো গোখরো সাপ! হ্যাঁরে মা, তুইও বুঝি এমন করে সবার সামনে কাঁদতিস? ওরা মুখ ছুটিয়ে ছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তোকে আমি দেখিনি। আ···হা···হা কত কেঁদেছিস মা, তাইত ওরা ঢুকতে দেয়নি। এত কাঁদতে হয় রে! এইতো তোর মা। বলে সাবিত্রী নিজেকে ইঙ্গিত করল।

মায়া ডুগরে কেঁদে উঠল, মা তুমি চুপ কর।

ওঃ, তবে ডাক্তাররা মুখক্ষম করেছিলো? ওদের আর এক নাম ভগবান। হ্যাঁরে মা, ভগবান এত দেমাক দেখায়? তাঁরও কি ওদের মত সীমিত ক্ষমতা?—মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল নাই।

আবার অনেকে লড়েও হেরে যায়। তবে দেখ, লড়তে চায় না, শুধু ভগবানকে ডিঙিয়ে যাবার ধান্দা তাইতো দয়ার পাথর। কথায় পাথরের মাঝে সবুজ ঘাসের চিহ্ন। জানিস মা, ওদের মা, বাবা বোধ হয় বুকে নিয়ে মানুষ করেনি। ঝি চাকরাণীর কোলে বড় হয়েছে অধিকাংশ। তাই মায়া দয়া ওদের শরীরে নাই। যেন প্রতিহিংসার অহংকারে আহাম্মক,

নিছক অংক হিসেবী, ভগ্নাংশে জ্ঞান নাই।

মায়া মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, তুমি চুপ করে থাকবে, না আমি উঠে যাব?

সাবিত্রী পুনরায় কথা বলতে মুখ সরিয়ে আনল।

মায়া বলল বেশ, আমি তবে এই উঠলুম, বলেই সত্যই মায়া উঠতে গেল। সাবিত্রী মেয়ের হাতদুটো ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, জানিস কথা গুলো মনের ভিতর ধাঁদা বেঁধে ছিল, কাকে বলব? কে শুনবে?… তোর বাবা… ! যাক, বলে যে কি আরাম পেলাম মা, কি বলব। দেখ মা, সজ্ঞানে দশদিন হাসপাতালে কাটিয়েছি। বলতে কি জানিস, মানুষ চারপো মহাপাপ না করলে, ঐ চোখের মাথায় নরক দেখেনি। হ্যাঁরে মা, তোর বাবা ঘরের বাইরেই কাটাত? ও, এমন বিপদেও মনে হয়নি এটা তার ঘর, তার সংসার, তার ছেলে মেয়ে? ভগবান এই হোল সাবিত্রীর জীবন! জানিস মা, মা মরলোতো সব গেল। দেখনা তোর মামা, কেমন মানুষ! পড়াশুনা করেছে। মাসীও কেমন মহাভারত পড়ে, রামায়ণও মুখস্ত। আমিও পাঠশালা গেছি, ভাবি মহাভারত পড়ব, রামায়ণকে মুখে মুখে বলব। কিন্তু আবার ভাবি কে শুনবে? —ঐ তো মানুষ। বলে বসবে, জানিনি বলে বুঝি পাপীকে কেষ্টনাম শুনচ্ছো। সত্যই এমন কেষ্টর হাতে পড়েছিলুম, যে আমাদের ছোটজাতের জন্য লেখা পড়া নয়; তাই ভগবান বুঝি দেখিয়ে দিলে। তারপর আবার আরম্ভ করল হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম, তা হোল, দশ বছর বেলায় মা মরে যাবার জন্য। যাক তোর বাবা হাসপাতলে যেত?

মায়া বলল সে না গেলে, কে মাসীর খাবার নিয়ে যেত।

সাবিত্রী বলল ওঃ তোর মাসীর ভয়েই তবে কদিন ঘরেই কাটিয়েছে, নেশা করেও ধরা পড়েনি। বুঝলি মা, তোর মাসী যদি মাসখানেক আমাদের ঘরে কাটাত; তবে বুঝি মানুষটা মানুষ হতো।—তারপর ছেলের দিকে যেই নজর পড়ল, অমনি বলল যা, যা, কালু ক-দিন ঘুমোয় নি। ও দেখছি, সেই যে ঘুমিয়েছে, এখনও ওঠার নাম নাই। হ্যাঁ মা, ছোট বেলার কথাগুলো যেন ফুল ফোটার মত পর পর মনে আসছে। মা সাপে কেটে মরল। ছোট ভাই তখন আমার কালুর চেয়ে বড়। তাও কত আর বড়, বোধ হয় চলি চলি করে হাঁটে। বাবা মস্তবড় গুনিণ ছিল। ভাই-এর গোটা গায়ে জড়ি বুটি বেঁধে দিল, যাতে কেউ খারাপ কিছু না করতে পারে।

আমি তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো সব করতুম। আমাদের ঐ সর্বনেশে পুতুল বিয়ে, যে দেখে, সেই চোখ কপালে তোলে। কেউ কেউ মুখ ফুটে ঘেন্না করতে লাগল। বাবার কানে উঠল। বাবাও দাদার পড়াতে ইতি করে বউ নিয়ে এল। বউদি সত্যিই মায়ের মতই। দেখ, আজও ছোট ভাইকে মুখ করেনি, সেও বউদি বলতে অজ্ঞান। তারপর ছেলে দেখা শুরু হোল। তোর দাদু গুনীণের কাজ করত। বাবাও চোখ বুজে তাকে বেয়াই করল। দেখ মা, এই হোল গুনীণ মালিকের পুত্র-বধূ আমি সাবিত্রী দাসী। তারপর কালুর মাথায় হাত বুলিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল হ্যাঁ, কি মহাপাপ! বাইরে কাটাতিস ঠিক আছে, একেবারে যদি বেড়িয়ে যেত তবে বোধ ঐ গর্ভযন্ত্রণার পরেও এই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হোত না। কি কষ্টে যে সংসার চালাতুম, সে শুধু যার দেওয়া, সেই ভগবানই জানত। কেন যে সে আসত, কি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, সেই জানত। না···কি মহাপাপী আমি! কে দেখবে, কে ওদের বাঁচিয়ে রাখবে, কে ওদের সংসারী করবে···ভগবান!

মায়া বলল আচ্ছা মা যদিও দুদিন বাঁচতে, তাও কি তোমার ইচ্ছা নাই?

সাবিত্রী বলল ঐ জন্যেই বুঝি চোখ থেকে জল পড়ার বিরাম নাই। নারে মা, আমি বাঁচব, হ্যাঁ আমাকে বাঁচতেই হবে। আমার কালু বড় হবে, নইলে কে ওকে দেখবে? মানিককে স্কুলে দিয়েছি পড়ুক এখন। খাটতে শিখলে, ওর পড়া বন্ধ রেখে চাঁদুকে স্কুলে দেব। তারপর কালুকে সাজগোজ করে বাবুদের ছেলেটি করে স্কুল পাঠাব।

মায়ার মুখে কোন কথা নাই।

পুনরায় সাবিত্রী বলল হ্যাঁরে, জামাই কবে এসে ছিল, কবেই বা গেল? বিয়ের পর ছেলেটার মুখটাও যে আর দেখলুম নি! শোন মা, বলি শোন, তোর বড় মাকে একবার ডাকত, বলি, যেন সে কর্তাকে একবার পাঠায়, দেখেও শান্তি পাই। আ···হা কত আশা। মেয়ে জামাই আসবে, কত আনন্দ করে খেতে দেব। তোর বাবার কি আনন্দ! লাউ শাকের তরকারী হবে, সরুচাকুলি পিঠে হবে, পুরতে দেব, কত কি, আর ঐ শোনাই শোনা, যম বুঝি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মাথার উপর কাপড় মেলা বাঁশের উপর কাকটা কা-কা করে উঠল। মায়া সে দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল ও-মা তুমি মুখ বন্ধ করবে। তাদের মা বেটীর চেঁচামেচিতে কালু ঘুম থেকে উঠে চোখ ঘষতে ঘষতে কান্না জুড়ে

দিল। সাবিত্রী ছেলেকে টানতে গেল, কিন্তু মায়া হাত বাড়িয়ে বলল, এই যে আমি, আয় এখানে আয়। সঙ্গে সঙ্গে কালু দিদির কোলে এলো। মায়া সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ কাপড়ের খুঁটে মুছিয়ে সাগুর গ্লাসটা মুখে ধরল।

সাবিত্রী বলল হ্যাঁ মা, ধন্য তোর জীবন, মা না হয়েও মায়ের কাজ করছিস ?

॥ তিন ॥

সেদিন যখন মালতী এসে হাজির হোল, তখন সাবিত্রীর মরণ ঘনিয়ে এসেছে। সে তক্ষুনি জগু ও তার স্বামী শিবু মালিককে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনল। কিন্তু সাবিত্রীর তখন পরপারে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। শুধু স্বামী জগু এসে যখন বলল ওঃ এতো বিকারে বকছে! তখনই সাবিত্রী বলল হ্যাঁ, গুনীণ মালিকের ছেলেত তুমি—হুঁ, কত গুনিণী কর তাই আমি সেই দেখতেই চলে এসেছি।

বলতে কি, এটাই তার শেষ কথা। কারণ বলতে সে অনেক চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তার কথা বলার শক্তি শেষ হতে হতে অবল হয়ে পড়ল। চিকিৎসার কথা নূতন করে কেউ আর ভাবেনি। কারণ সবাই ধরে নিয়েছিল, তার আর বাঁচার উপায় নাই। আজ নয়, আগামীকাল সে মরবেই। মালতী গঙ্গামাটি নিয়ে সাবিত্রীর কপালে মাখাতে লাগল। অন্যদিকে মায়াকে ধরে রাখে এমন সাধ্য কারো নাই। হঠাৎ দাঁত পড়ে গিয়ে ব্যাচারী অজ্ঞান হয়ে চুপ করে পড়ে রইল।

॥ চার ॥

সাবিত্রীর শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে গেছে। কুমুদ আরও একদিন কাটিয়ে ঘর গেল। জগু চক্ষুলজ্জার খাতিরেও বটে, আবার পাঁচজনের বকা-ঝকায় ঘরের বাহির হয়নি। ছাগল কটি ও সাবিত্রীর হাতের দুধোলো গাইটি নিয়ে মাঠে কাটায়। সকালে বের হয়—দুপুরে ঘরে এসে খায় ও বিকালে মাঠ থেকে ফেরে। সন্ধ্যায় পাড়ার পাঁচজনের ঘরে গিয়ে গল্প করে। আবার অনেক সময় বাপের দেওয়া বিদ্যাটাও কাজে

লাগায়। ওটাই তার কাল। কারণ কবরেজীর টাকায় সে নেশা করে ও তখনই তার যে বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, সবাই টের পায়। মায়া সমস্তই খবর রাখে। সে মাঝে মাঝেই কবিরাজী বক্কাল ঢেলে ফেলে দেয়। আবার পাতা ও গাছের ছালগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। জগু সব বুঝতে পারে। তথাপি মেয়ের উপর কথা বলতে পারেনি।

তিন ভাই—নেড়াবেল। তাদের মাথা ভাল করে সরষের তেল মাখায় তারপর মেজ বোন জয়াকে নাইয়ে আনতে বলে। ছোট বোন ছবিও দিদির সঙ্গে গিয়ে ভাইদের সঙ্গে চান করে আসে।

মায়া সকালে ন্যাতা ধরে, তারপর রান্না ও ভাইবোনদের নিয়েই দিন কাটায়।

সাবিত্রী লোকের ক্ষেতে খাটতে বের হোত না ঠিকই কিন্তু জগুকে পাঠিয়ে, নিজে ছাগল ও গাইটির দুধ বিক্রি করে সংসার চালায়। কিন্তু মায়া আজ আতান্তরে পড়ল। কারণ গাইটি এখন বাছুর বিয়োয়নি তার উপর মা মরার পর থেকে জগু কেমন যেন বে-ভাবুকের মত হয়ে কাটাত, তারপর নেশার বহরটাও বাড়িয়ে দিয়ে অন্য মানুষে পরিণত হয়েছিল। মদ খাবার সঙ্গিদের পাল্লায় পড়ে সে ছাগল বিক্রি করতো কিন্তু করল না।

সেদিন সকালে চটপট ঘুম থেকে উঠে, তারিণী চক্রবর্তীর কাছ থেকে হুঁকোর জল আনল। তার সঙ্গে দু তিন রকম গাছের পাতা বেঁটে মেশাল, শেষে অর্জুন ছাল বেশ করে শিলে থেঁতো করে রস বের করে বক্কাল তৈরি করে বোতলে রেখে চান করতে গেল।

মায়া সকাল থেকেই বক্কাল তৈরী করা দেখে বাবার উপর রাগে গোঁভরে কাজ করছিল। শুধু অপেক্ষা করছিল, কখন কারা সামান্যক্ষণের জন্য অন্ততঃ ঐ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। সেইজন্য জগু, যেইমাত্র গামছা হাতে ঘর ছেড়ে বের হোল, অমনি মায়া গিয়ে বোতলসমেত বক্কাল উল্টে ফেলে দিয়ে বলল, খেতাবওলারা থাকতে গো বদ্দির কাছে যত সব মরণ!

নে আয়, মদ খাবি আর চলে যাবি।

জয়া এসে বলল হায় দিদি, একি তোর ঝাঁট দিয়ে দেওয়া! সোনা কাকার বক্কাল যে ঝাঁটার ডগে ফেলে দিলি।

মায়া পেটমরা বাঘের মত তেড়ে এসে বলল চুপ করবিতো কর, নইলে দেখছিস এই মুড়ো ঝ্যাঁটা!—বক্কাল! বের কর মুখপোড়া

পকেটের পয়সা, বের কর। দেখি ক দিন নিজের পয়সায় ভূত-ভোজন করাস। মদ খাবে মদ। পরের মাথা কেন, নিজের মাথা আগে খা।

জয়া বলল হ্যাঁ দিদি, যেদিন আমাদের লাল পাঁঠিটা হারিয়ে গেল, সেদিন দেখি সোনাকা বাবার কাছে মদে টর হয়ে বসেছিল কি করে যে ঘর গেল তাই ভাবি। ওদের কি মরনেরও ভয় নাই ?

মায়া বলল মরবে, মুখপোড়া মরবে ! তাহলে যে ভগবানকে সবাই ভগবান বলে ডাকবে। ওদের জন্য মেঘ চিকরোয়নি। আঝাড়া খায়নি। গুন্ডা বদমাইশদের ছুরি মরচে পড়ে ভোঁতা হয়, নয়ত খতম করতে গিয়ে হাত ফসকে যায়।

কিন্তু মালতী ছাগল গরু মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসে বলল নারে না, ভগবান দেখে মানুষ কতটা বাড়ে। তোদের যে ছাগল হারিয়ে গেছে, কে বলল ? মুখপোড়া মুনিয়ার সঙ্গে মদ খাবার জন্য, পাইকেরের ছাগলের পালে ছেড়ে দিয়ে টাকা গুনে নিয়েছিল। মুখপোড়া মুনিয়াটাকে ভিটে ছাড়া করত !

কর্তাকে আজই বলছি হ্যাঁ, মেয়েটা ভদ্রভাবে বাঁচতে চাইছে, ওর যত সব উট্‌কো ঝামেলা।

তিন জনাই চুপ। তারপর মালতী পুণবায় বলল, কি বলব বল, তোর পিসিই যদি তোদের নিয়ে পাঁচজনের কান ভারী করে, তবে কাকে কি বলব। জানিস জোবি, ঠাকুরে ঝি লোকের কাছে কি বলে বেড়ায় ? তুই নাকি তোর বাবাকে ভাত দিতে মুখ করতিস। শুধু তাই নয় আছিস তো কটা দিন শ্বশুর ঘর চলে গেলে, সে-ই এসে রান্না করে দাদাকে খাইয়ে যাবে। জয়া বলল, যমুনা পিসী মা যখন ছিল, তখনই কাঁদুনী পালা গেয়ে গেয়ে চাল নিয়ে যেত। আগামীকাল দিয়ে যাব বলে মাসাধিক কাল আর দেখা দিতনি। দেখতে এলুম বলে সকালে ঢুকত, লাউঝাড়, পুঁইঝাড় গপগপ করে দুপুরেও খেয়ে উঠত !

মায়া বলল, পিসি খাবে তাতে আমাদের কমে যাবে নি, কিন্তু ছাগলের দড়ি, গরুর খড়, আবার পেট কাপড়ে করে আলু পেঁয়াজ যা পেত তাই নিয়ে যেত। চোখাচোখি হলেই বত্রিশ খানা দাঁত বের করে বলত, ভাই-এর নিয়ে যাব নিতো কার নিয়ে যাব। তোরাও শ্বশুর ঘর যা, আমার মত কালুর জিনিষ পেট কাপড়ে তুলবি বলেই কালুর গাল টিপে দিত।

আমরা রেগে উঠতুম, মা বলত যাক ছেড়েদে, ঝিউড়িরা বাপের সব নিয়ে গেলেও কুলায়নি।

মালতী বলল হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলের লতায় পোয়াতির পেট ভরে। যাক নিজের হাঁড়িত ঢণ্ ঢণ্। ভাই-এর ঘরে খাবে, আবার সংসারের জন্য যেখানে যা পাবে নিয়ে পালাবে। খবরদার বলছি ; অমন মাগিকে কখনও প্রশয় দিবি নে। মাগির কথা শোন,—দুগ্ধ পোষ্য ভাইপোগুলো উপোষ দিক, আর মাগি খেয়ে পেট মোটা করুক।

উঠোন থেকে শব্দ এল, ও এসে গেছে। কেন, মোনা ছোঁড়াটা গেল কোথায় ? এমন সময়, এই দুপুরে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পর উঠোনে খটানো বাঁশে ভিজে কাপড়টা মিলতে মিলতে বলল—যাই বাবু, এই যে যাই।

মালতী চাপাস্বরে বলল টাকা দিয়ে পাঠায় নি কিন্তু।

জগু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল কি! চান করে ইষ্টনাম জপতে জপতে আসছে, আর টাকা দেয় নি। না, না ভাল কথা নয়, সে কি তার হাতের জিনিষ আগে ছাড়ে, না টাকাটা আগে বুঝে নেয় ?

মালতী মাথার ঘোমটা আরও টেনে একরকম মাটিতে ছুঁই ছুঁই করে বলল—মদ খেয়ে টর। শুধু বলে পাঠাল, বলিস আগে ভাল হই, তারপর টাকা। তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তবে আগামীকাল আবার জামাল পাইকের ছাগল নিয়ে যাবে, তার পালে ছাগল ঢুকিয়ে টাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

জগু বলল—শোন, ওসব চালাকী অবিনাশ কবরেজের কাছে করতে বলো। আমি সাধন কবরেজের ব্যাটা, বাবার মত, টাকা দাও বক্কাল নাও। তার পর দু-পা পিছিয়ে এসে বলল, শালা, তুই মদ খাওয়া নেশা করবি, আর যার তার কাছে যাই তাই বকবি। বলি শালার কি বাবার ছাগল, হুট করতেই ছাগল পালে ঢুকিয়ে টাকা গুণে নিবি। কত বলেছি—ওরে আমাকে দেখিয়ে মদে চুমুক দিবি। চিকিৎসা করাবি, অথচ কবরেজের কথামত চলবি নি, তারপর একটু থেমে বলল—না, বাবু না, আমার দ্বারা ভাল করা সম্ভব নয়। কেন, দুর্নাম দেবে খরচ হলো, অথচ রোগ সারল না।

মালতী আরও আস্তে আস্তে বলল—আমিও তোমার ভাইকে ঐ কথাই বলি। নেশা না করলে যখন বাঁচবে, তখন কবরেজের কথামত খাও। তাতে কি উত্তর করে জান ? সে-ই যদি বোতলের তিনপুয়ো মেরে দেয়, আমার রইল কি! পয়সাটা আমার না ? জিজ্ঞেস করে দেখ দেখি, এমনি তাকে দুটাকা কম দিলেও মুখ বাঁকায়নি।

জগদ্ দুপা গিয়ে বলল-ভাসুর ভাদর-বউ ঠিকিই, কিন্তু ওষুধ আনতে এসেছে, ব্যায়রামের ব্যাখরাগুলো ঠিক ঠিক বলতে হবে, অত আস্তে আস্তে বললে, কানে ঢুকবে কেন ? যাক মোনা তাহলে স্বীকার করেছে আমার বক্কাল তৈরীর হাত আছে। এইতো, বাপ্‌কা ব্যাটা বলে, লোক তাহলে পরিচয় পাচ্ছে। হুঁ, হুঁ, এমনি আমি বাবাকে ছাড়িনি !

মালতী বলল কি বলব, এইতো সেদিন ফস করে বলে ফেলল, এক গ্লাসের ইয়ার, তাই সবাই বলে বক্কালে তেজ নাই। আমি বললুম—তবে সবাই বক্কাল আনে কেন ? উত্তর দিলে, আমি খাই, কাজ হয় কিনা, নেশার খেয়ালে ওসব জানা নাই।

জগদ্ বলল—না, না, সত্যি বলছি বউমা, আমি তাকে বক্কাল দেবনি। শালা—ধারে ব্যবসার নামই পচা মাল, বলেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেল নেশা, নেশা, রাতদিন নেশা—হ্যাঁরা, তুই কি মুনিয়া পাখি, যে বুলি শেখাব, ওরে, নেশা করলে বক্কাল কাজ করেনি। পিছন থেকে হঠাৎ উত্তর এল—কে বললে, আমি নেশা করেছি ? হ্যাঁরে জগদ্দা, তুই এই দিন দুপুরে নেশা করিস নিতো ? বুঝলি, ঐ জন্যই তোর বক্কালে সত্যি বলছি কোন কাজ হয়নি—রামের বদলে লক্ষণ আর সীতার বদলে রাবণ দিস। তাহোক এমন সময় কোথায় মাল পেলি তুই ? তারপর একটু থেমে বলল, এই আমি ভাবতে ভাবতে আসছি, ক-দিনের আজ মদের ভাটি চাপিয়ে ছিলুম, প্রথমের আদোতটা তুলে ছিপি বন্ধ করে রেখে এসেছি ! গিয়ে গরম গরম দুজনে মৌজ করে খাব। আর তার আগেই তুই ফ্ল্যা…ট ! তাহোক জগদ্দা, তুই যদি আমার আর মাল না কিনিস, আমার ভাঁটি বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্গী সাথী কেউ আসবেনি। বিশ্বাস কর, পেটে হাত বুলিয়ে, কপালে হাত চাপড়ে মরতে হবে।

রাগে অপমানে জগদ্ ঘর থেকে একরকম শিকার ছাড়া বাঘের মত বলল, নিকাল শালা, নিকাল ! আমার বক্কাল পরীক্ষায় এসেছিস ?

বউকে পাঠিয়ে, নিজেও এসে হাজির। হ্যাঁরে শালা—কার ছাগল ? রোজ জামালের পালে ঢুকিয়ে টাকা দিবি, নেশা করাবি বলে আমাকে ঠকাবি শালা ঠকবাজ,—নাম আমার দোর থেকে, নাম বলছি, শালা, নাম ! জানিস আমি সাধন কবরেজের ছেলে জগদ্ মালিক হাঁক দিলে এখুনি দশটা গাঁ সাড়া দেবে।

মুনিয়াও তেড়ে এসে বলল—বক্কাল দিবনি ঠিকআছে, কিন্তু হুবহু মিথ্যেকথা গুলো বলবি কেন ? আমিও কি ফ্যালনা। আমার বাবাও গাঁয়ের

চৌকিদার ছিল জানিস ? নেহাত তোর পাল্লায় পড়ে মদ ধরেছি তাই। তারপর এগিয়ে এসে বলল, বলি কই আমার বউ তোর ঘরে বক্কাল আনতে এসেছে ? দেখা বলছি দেখা—দরকার নাই অমন পেয়ারের বন্ধুর। টাকা ফেললে অমন কত বন্ধু মিলবে। শত-শত হাজার হাজার, লাখ লাখ।

জগু বলল, কি বলবি, ঐ তো তোর চোখের মাথায় দশ হাত ঘোমটা দিয়ে কথাগুলো সব হজম করছে, নে, এগিয়ে গিয়ে দ্যাখ, তোর বউ কিনা ?

মুনিয়া আরও এগিয়ে এল। জয়াও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মায়া তাকে চোখ টিপে হাসতে নিষেধ করল।

মুনিয়া বলল—জগুদা, তুই কি ভোজ বিদ্যাও জানিস নাকি ? আমার বউতো ভাত খাচ্ছে দেখে এলুম। আর তার পরণে আট হাত-ই জোটে নি : দশহাত ঘোমটা দিতে কোথায় পাবে ? ধান্দাবাজ কোথাকার ! বক্কাল করিসনি সেটাই বল। জগু গোঁ ভরে এগিয়ে এল—কি বললি, বক্কাল করিনি ?

শালা যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! বলে পড়ি কি মরি হয়ে বক্কালের শিশিটা নিতে গেল। কিন্তু মাটিতে ঢালা হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, মায়ার দিকে চোখ করে বলল, দ্যাখ, তোর জন্য আমাকেও গলায় দড়ি দিতে হবে! আমি দুটো পয়সার ধান্দা করব, আর তুই মাটিতে ফেলে দিবি, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিবি। বলি, আমি কি তোর শত্রুর ? এতক্ষণ মালতী মাথার ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে বলল—বেশত চান করতে গিয়েছিলে, মেয়ে যদি একহাঁটু ধুলো, জঞ্জালের উপর আসনটা পেতে ভাতের থালাটা ধরে দিত, তবেত বলতে, আঁস্তাকুড়ে ভাত !—অলক্ষী দূর-হ চোখের মাথা থেকে। কেন, তোমার বক্কাল যেখানে সেখানে থাকবে কেন ? ঝাঁটায় লেগে ঢালা হয়ে গেছে ত ওর ভারী দোষ !

মুনিয়া চোখ কপালে তুলে বলল—বড় বউদি তুমি !

মালতী বলল—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, আমি। তারপর মায়াকে বলল, শোন মায়া ঐদুটোই চোরে, চোরে মাসতুতো ভাই। আজ দুটোকেই একসঙ্গে পেয়েছি, জিজ্ঞাসা করত—তোর লাল পাঁঠিটা হারিয়ে গেছে, না দুজনে আধা দামে বেচে মদ গিলেছে ?

দু-জনই বলল—বউদি !

মালতী বলল—চুপ ! বউটা তো, দুঃখ কষ্ট করতে করতে, ভগবান আর সইতে না পেরে, নিয়ে নিলে। মুখপোড়া, তুই যে পাপী, তাইত,

চুরি করছিস, ভণ্ডামী করছিস, আর সেই টাকায় দিব্বি মদ গিলছিস। আশ্চর্য, ছেলেমেয়েগুলো ছাগলের জন্য কেঁদে কেঁদে মরবে আর উনি নেশা করবে!

বিচার জানা, মায়া তুই বিচার জানা। না, না, তোকে জানাতে হবেনি, যাচ্ছি, আমি কর্তার কানে তুলছি দেখি কি হয়! মায়া কাঁদতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

সমাজ বিপ্লবে, বাঙালী চড়ুই মুখে, বড়াই করে—আমরা বিপ্লবী! হ্যাঁ, মানতে হয় তাদের বিপ্লবের মহিমাকে। জাত পাতের প্রশ্নে, তারা দেখে পছন্দ। তাই পছন্দটাই যদি প্রথম ও শেষ হয়, তবে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের শেষ নেই কেন? যাঁরা এই প্রশ্ন করেন কিংবা যাঁরা শুনে থাকেন, তাঁদের মুখ প্রতিবাদ করতে করতে গেঁজিয়ে উঠে কেন? তাহলে বলতে হয়, সবার রুচী সমান নয়। এখানেই বাঙালী এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছে। কারণ, এরা অধিকাংশই জানে, রুচি অর্থ জিভের স্বাদ তাই ভাবুক বাঙালীরা মনে করেন কিনা জানি না—এটা যদি জিভে ধরা না পড়ে, মনে ধরা পড়ত, তবে বোধ হয় এতদিনে বাঙালী পা, পা করে হাঁটত। কিন্তু মন যেহেতু চায় না, সে-ও ভাবে পঙ্গু। তাই তারা বিপ্লবী বাঙালী নয়,—বাঙালী বিপ্লবী।

জাতীগত বৈষম্যের শিকার, মায়াও সাত, সাত—চোদ্দ পাকে বাঁধা হয়ে রইল মাথায় মাথায়, আঠার দিনের দিন কুমুদ মায়াকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে এল। শ্বাশুড়ী নাই। খাতির ঠিকমত হবে না কুমুদ পাড়ার পাঁচ জনের মুখে শুনে নিয়েছিল। তাই কোন রকম চোখ কান বুজে দুপুরটা কাটিয়ে শ্বশুরের দেখা সাক্ষাতের আশা না করেই ইস্ত্রীকে বলল দেখ, আমার দেরি করলে চলবে না, আমি তোমাকে আজই নিয়ে যেতে চাই।

মায়া বলল সেকি, এইত এলে। আমাদের রীতি আছে না-কি, শাক বুনে, সেই শাক খেয়ে তবে যে নিজের ঘরে পা বাড়ায়। আর তুমি যে তার উল্টো। তোমরা এত শিক্ষিত হলে কবে?

কুমুদ বলল শিক্ষিত হলেই কি অভ্যাস বদলায়? বলতে পার অভ্যাসটা শিক্ষিত হয়। আমি শুধু নাম সই করতে জানি বলে খোঁটা দিও না।

মায়া বলল—নিজের লোকের কথাই যদি তোমার কাছে খোঁটা হয়, তবে খোঁটা তুমি এখনও কারও কাছে খাওনি। তারপর ঢোঁক গিলে গিলে বলল, একে তোমার সময় নাই, তার উপর যা তুমি চাওনা, তাই নিয়ে মন ভারি করাটাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছি, জিভ সায় দিচ্ছে, কিন্তু তুমি মোটেই শুনবে না। জানি আমি পরস্ত্রী, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, নূতন সংসার কি গড়ব, যার জ্বালায় জ্বলে গেলুম নূতনে সে জ্বালা কি মিটবে ?

তার চেয়ে শোন, বুঝে উত্তর দাও। মা-মরা দুগ্ধ পোষ্য ভাই বোন-গুলোকে ছেড়ে, কি তোমাকে পেয়ে আমি সুখী হবো ? কাজে মন বসবেনা। তুমি সোহাগ করলেও, আমি তো সোহাগিনী হতে পারব না। তখন আসবে, নিজেদের মধ্যে অহেতুক অশান্তি। পাঁচজনও বলবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা নাই। তাই বলছিলুম, এদের আত্মীয় তুমি। এদের দেখা তোমার অধিকারত বটেই, কর্তব্যও। হ্যাঁগো—আমার মত তুমিও, একটু কর্তব্য কর না ?

কুমুদ বলল—আমার কি করা উচিত, কি অনুচিত, আমিই বুঝব। তুমি তবে যাবে না বলছ ?

মায়া বলল—মুখে বললে কি ভাল শোনাবে ? একবার ভেবে দেখ না, বাড়ীতে তোমার মা, বাবা আছে—আরও, সাবালোক এক ভাই। সংসারে কোন অসুবিধা হবে না।

কুমুদ চোখ কপালে তুলে বলল তুমি কি ঘর জামায়ে থাকতে বলছ ? স্ত্রীর মুখ যদি নাও দেখতে পাই, তবুও আচ্ছা—কিন্তু শ্বশুরের অন্ন ! না, না ও কুষ্ঠীতে নাম লেখাই নি।

মায়া বলল—আমিও নিজেকে কারো কাছে বিকিয়ে বাঁচতে বলছিনি। কেন তুমি অলস না লোভী ? তারপর শ্বশুরের তো তেজারতি নাই, যে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাবে। কেন তোমার গতর ভাঙিয়ে তো দিব্যি চলবে—কথাটা ভেবে দেখনা। তারপর একটু হেসে বলল,—দেখছ ভাই দুটো, কচি বোনটা দুপুরে গরমের চোটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, উঠে কি চাইবে বল ? কিন্তু পাবে কি মায়ের একটু কোল, না একগ্লাস জল। আর কিছু ? তুমিও এককালে ওদের মত ছোট ছিলে, একটু ভেবে দেখনা—বলে অসহায়ের মতো কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কেমন মায়ায় পড়ে আছি। আমি যদি তোমার শরীরের অর্ধেক হই, তবে তুমি আমাকে অর্ধেকটুকু দিলে আমি ওদের বড়ো করি, মানুষ হোক ওরা।

তারপর তোমার সংসারেই ফিরে যাব।

কুমুদ বলল—দেখ, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার মানুষ আমি নই। এই আমার হক কথা। তারপর বলল—জান বিয়ে করলে আবার তার হাত ধরে, ঘর করতে পারব। কিন্তু সময়ের সুখ গেলে, সে সুখ ফিরে আসবে নি।—শোন, পিপাসা পেলেই চাতক ফটিক জল বলে আকাশে তাকায়।

মায়া বলল—হ্যাঁ, বউ একটার বদলে তিনটে মিলবে। কিন্তু সুখ মিলবে না। যাক তুমি যদি এত জ্ঞানী জানতাম, তবে প্রথমেই…। তারপর রাগে, অভিমানে নীচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীকে বলল আচ্ছা, তুমি তো দুদিনে বড় হয়ে উঠনি, বুকে নিয়ে কত কে আদর করেছে। মুখে মুখ এনে চুমু খেয়েছে—তুমি হেসেছ, তবেইতো তারা হেসেছে। তাই আমি যদি না, ওদের হাসাতে পারি, তবে হাসব কি করে? তারপর তুমি কোলে কোলে বড় হতে আরম্ভ করেছিলে। কোল দেখলেই ওঠার জন্য হাত বাড়াতে। যখন সে না নিত, তখন তুমি কাঁদতে নি, বল না সত্যি কিনা? দেখ, ছোট ভাইটা ঘুম থেকে উঠে কি কান্নাই কাঁদতে শুরু করে। যেখানে যে কাজই করিনা কেন, ছুটে এসে কোলে তুলি, নয়ত মেজ বোনের কোলে দিয়ে শান্তি পাই। ও এখনও চেয়ে খেতে পারে নি। ক্ষিদে পেলেই কাঁদে। তুমি চাও একই মানুষ একজনের কান্না দেখবে আর একজনকে সুখী করার জন্য মন প্রাণ উজাড় করে দেবে। এ কখনও হয়নি। যারা পারে বলে তারা পারেনি। সংসারে তারা ডাইনী! বল না, তুমি ক্ষিদে পেলে কাঁদতেনি, ঘুম থেকে উঠে মায়ের কোল খুঁজতেনি? কোলে নিয়ে বেড়াতে তুমি চাইতে নি?

বলবে যার যেমন ভাগ্য। না, না, তোমাকে ছাড়া বলার মানুষ কে আছে? কে শুনবে? তুমি যেমন অপরের হাত ধরে বাঁচতে চাইছ, সময়ে, সুখের স্বর্গ খুঁজে নিচ্ছ; ওদের জীবনেও, এই সময় আসবে। ওগো, অপরকে শান্তি না দিলে, নিজে কখনও শান্তি পাবেনি। ঈশ্বর বল, আল্লা বল, জানি না, কে কোথায় কেমন অবস্থায় থাকেন। তবে বলতে পারি এটাই স্বাভাবিক। তাই আপাতত মধুরটা মধুর নয়। দেখনি, মানুষ মধু খায়। কিন্তু চাক ভাঙে, তবেইতো। তাই মানুষ চোর, হননকারী। কিন্তু সেই মধুই মৌমাছি খায়। কিন্তু ভেবে দেখ—ওরা মধুর মধ্যে ডুবে থাকে। তাই তুমি যদি আমাকে নিজের মনে কর, আমার মধ্যে ডুবে থাক, তবে দেখতে পাবে তোমার কর্তব্য থেকে তুমি বঞ্চিত

হওনি।

এতক্ষণে কুমুদ মুখ তুলে বলল—তোমার মা যদি জানত, তার অকাল মৃত্যু হবে, তবে কি সে তোমাদের গর্ভে ধরত নি?

মায়া বলল—দেখ, আমরা সবাই বাঙালী, তাই যার যা আশা থেকে যায়, তারই পূরনের জন্য বার বার আমাদের এই মায়ার সংসারে আনা-গোনা। আসি মাত্র পাপ স্খলন করতে। এই যে—তুমি সময়ের সুখ বললে যৌবনের সুখের মুহূর্তগুলির কথাইতো। কিন্তু বিয়ের পর ঐ মুহূর্ত ক-দিন? যখন কোলে আসে নতুন মানুষ, তখন তার চিন্তায় বিভোর। তাকে লালন-পালন, বড় করা,—মানুষ করাই বড় হয়ে উঠে। তখন স্ত্রী, স্বামীর সুখ ভাগ আর সন্তানের লালন পালনের ভাগ কি, ভাগ করে নিতে পারে? যখন যাকে না দিয়ে শান্ত করে সুখ দিতে পারে। তাইত করে, না তার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে? না, সে তার জীবনে প্রয়োজন মনে করে? কারণ সে যে তখন মধুতেই ডুবে থাকে। তাই তার কাছে মধু দামী নয়। সে দামী। তাই আমাকে নিয়ে যে তোমার, সময়ের সুখ, ওটা আপাত মধুর, আর যা বললাম, ওটা তোমার সমস্ত জীবনের সুখ। তোমাকে সামান্য একটা উদাহরণ দিই, যে মা বাবা তোমাকে বড় করে মানুষ করেছে, তুমি স্ত্রী সন্তান পেয়ে কি ভেবে দেখবে, মা বাবা ঠিক এমনটি করে তোমাকেও মানুষ করেছিলেন।

কুমুদ বলল তোমার মত জ্ঞান দেবার দরকার মনে হলে তখন ভেবে দেখব।

যাক, তুমি তবে যাবে না বলছ? তারপর একটু বিরক্ত হয়ে বলল দেখ তাতা কড়াইয়ে তেল ফেনা হয়ে ছিটকে পড়ে।

মায়া বিরক্তি নিয়ে বলল—ওঃ তুমি তবে ভাবছ, আমার তেল হয়েছে। না আমাকে ভুল বুঝতে চেষ্টা কোরনি।

কুমুদ বলল, না এমনি। এখন তুমি দেহমনে টগবগ করে ফুটছো, বলা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আরও কত জনকে—

মায়া বলল, যদি আমার মনে কলঙ্কের ছাপ ফেললে, তবে বলি, আমি যদি পরপুরুষকে মনে স্থান দিই তবে তুমি আর আমার এ-মুখ দেখবে না। আর যদি তা না হই তবে তোমার কথাতেই তোমাকে জবাব দিই—হ্যাঁ, আমি কড়াই-এর ফুটন্ত তেল। ছিটকে তোমার মনে ঘা করেছিলুম জ্বালা করবে, আমাকে মনে রাখবে।

কুমুদ মাথা হেঁট করে কথাগুলো শুনল। তারপর মাথা তুলে

বলল, যাক আমার এখন যা দরকার, তারই জন্য মললুম। বলে চলে গেল কুমুদ।

এই ঘটনার দু-মাস পর। আষাঢ়ের ঠিক মাঝামাঝি আবার কুমুদ এসে হাজির হোল। চোখে মুখে হাসির ছটা। মায়ার সামনে এসেই বেশ মেজাজী গলায় বললে, হুঁ, আবার এলুম। মায়া কুমুদের পোষাক, চাল-চলন, হাভভাব দেখে ধরেছিল, সে পুনরায় বিয়ে ঠিক করেই এসেছে।—জানতুম, তুমি আমার আর মুখ না দেখলেও সিঁথির দিকে তাকাতেই হবে এবং পাশে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতেই হবে, একদিন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে। যেমন আজ এসেছে—আমার সিঁথির সিঁদুর তুলে নিয়ে আর একজনের সিঁথে রাঙিয়ে তাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে ভেবে।

কুমুদ নিরুত্তোর।

কিন্তু মায়াই আরও সামনে এসে বলল, দ্বিধা কিসের? আমি আমার জীবনকে বন্যায় ভাসিয়ে দিলেও, তোমাকে কি বলতে পারি, এস, যদি তুমি আমাকে স্রোত থেকে তুলতে পার। কি আমার তোমার উপর অধিকার, যে আমি ডুবে গেলেও তোমাকে ডুব দিয়ে তুলতে বলি। আমার জীবনে বন্যা হোক, আর সেই বন্যার পলিতে তোমার জীবন হোক সবুজ।

কুমুদ, তথাপি কোন কিছু না বলে মায়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

মায়া বলল, না এ তোমার দোষ নয়,—দোষ আমাদের শিক্ষার। জাতিতে আমরা কড়া। সবাই জানে, স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর আনতে পারলে আবার ছাদনাতলায় উঠতে পারে। যাক্, সাক্ষী এনেছ তো?

কুমুদ বলল,…এ-সব……! তারপর বিষণ্ণ ভাব কাটিয়ে বলল, তুমি তবে সব খবরই রাখ?

মায়া বলল—না, খবরটা তুমিই দিলে। আচ্ছা একটা কথা বলব?

কুমুদ বলল—বল। কিন্তু মায়া, মুখ খুলতে গিয়েও, ইতস্ততঃ করতে লাগল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার সাক্ষীদের ডাক; আমি এই মাথার কাপড় সরিয়ে নিচ্ছি, তোমার দেওয়া সিঁদুর তুলে নাও। তারপর বলল, কিন্তু……।

কুমুদ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

মায়া বলল—না, না, ওতে কোন কিন্তু নেই। শুধু একটা অনুরোধ করবার সুযোগ দিবে?

কুমুদ বলল—কি?

মায়া বলল—দেখ, জীবনে আর হয়ত কোন দিন তোমাকে খেতে দিতে পারব না। শেষ বারের মত আমার হাতে কিছু খাবে?—স্ত্রী স্বামীকে সারাজীবন খাইয়ে সাধ মেটায়, পুণ্যি হয়। আমার পুণ্যির দরকার নাই। কিছুটা সাধতো মিটবে। বাকীটুকুর জন্য তাকিয়ে থাকব—এবার কিন্তু উপরওলার হাত।

কুমুদ আরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কারণ সে তাকে যে স্ত্রীর মর্যাদা থেকে বাতিল করে পরিত্যাগ করতে এসেছে। সুতরাং তার হাতে খাওয়া অমঙ্গল-ই বেশী। কিন্তু—?

মায়া বলল—না, না, অবাক হবার কিছু নাই। শুধু তোমাকেই নয়, যারা সাক্ষী হয়ে এসেছে, তারাও খাবে।

কুমুদ বলল, যারা তোমার সর্বনাশের কথা চিন্তা না করে সাক্ষী হয়ে এসেছে—সেই কনে পক্ষের লোক তোমার হাতে খাবে কি করে?

মায়া বলল,—তাদের ডাকতে পারি?

কুমুদ বলল—না, তারা আসবে না।

মায়া বলল, তুমি খাবে তো?

কুমুদ বলল, অন্য কিছু নয়?

মায়া বলল—তোমার স্ত্রী হয়ে এতদিন যা খাইয়েছি, যদি তুমি আমাকে তোমারটিই করেই রাখতে, তখনও যা খাওয়াতাম, আজও তাই খাওয়াব। কারণ, তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও, আমি জানি, তুমিই আমার সব। বিশ্বাস কর, আমার লজ্জা নাই, ঘেন্না নাই। কারণ আগের কর্তব্য করতে যাওয়াতে, স্বামী আমাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। নারী জীবনে এতো একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অভাবনীয় নজির।

কুমুদ আরও ভাবনায় পড়ল! কারণ নারী মায়াবী। কিন্তু স্ত্রী মায়ায় আবদ্ধ—মায়াবী মূর্তি তার তখন কোথায়? নারীর জীবনে চাওয়া-পাওয়ার শেষ থাকে না। কিন্তু এ-যে চাওয়া-পাওয়ার ঊর্দ্ধে। এ যেন ঘোল মুয়ে ননী তোলা। তাই সে বলল, বেশ খেলে যদি কেউ খুশী হয় তবে আমার খেতে অসুবিধা কোথায়?

মায়া দুয়ার ঝাঁট দিল। সামান্য জল ছড়িয়ে আসন পাতল। তারপর সেই গরীব ঘরের আলুসিদ্ধ শাক ভাত ও ঘরের এক বাটী দুধ ধরে দিল। কুমুদ বলল, এর জন্য তোমার আপ্রাণ চেষ্টা!

মায়া বলল. নিজের স্বামীকে নিজে খাওয়াব, তাতে কি খাওয়াব তার বিচার করি না। আমরা ভাবি, স্বামীর জিনিষ স্বামী খাবে, আমরা তার

ভোগ বিলাসে সাহায্য করি মাত্র। কেন, বার বার এই রকমই তো খেতে ?—বলতে পার, আগে থেকে জানলে আমিষের কিছু ব্যবস্থা থাকত।

আমাদের ঘরেও তো আছে। একটা ভেঙে ভেজে দিতে পারি। কিন্তু তোমার এই শুভ দিনে ওটা দেখিয়ে, তোমার মনে অশুভ চিন্তা আনি কেন ? কারণ আমি তো তোমার অশুভর কারণ নই। যেমন ভাবী শ্বশুর ঘরে আহারে তোমার মাছ, মাংসের কোনটাই হয়ত বাদ যেত নি। কুমুদ বলল—যাই খাইনা কেন—পেট ভরেই খেয়েছি। দেড় ঘণ্টার মধ্যে খেতে পারব, এমন খাওয়া খাইনি। তবে বলতে পার, যদিও বিয়ের দিন, তথাপি বর খাওয়া খাইনি।

মায়া বলল—থাক প্রথম বার বিয়ের কথা তবে মনে আছে ?

কুমুদ বলল—মনে আছে, না আছে জানি না, তবে এখন খেতে হবে এই টুকুই জানি। কিন্তু তুমি যা দিয়েছ, আর আমার যা ক্ষিদে, সে দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয়, সমুদ্র জলকণায় ঢাকা পড়বে।

মায়া বলল—ঐ জ্ঞানটুকু তোমার থাকলে, আমি ভগবানের কাছে রাজরাজেশ্বরী। বুঝবে, পুরুষের মন এমন-ই, শুধু জানার ভান। তাই স্ত্রী শিশির বিন্দু হয়ে সূর্যোদয়ে ঝিকিমিকি করে সমস্ত জলের কথা মনে করিয়ে দেয়—সুন্দর দেখায়।

হুঁ। বলেই কুমুদ খেতে বসল। বলল, খেতে বসতে হয় বসলাম। খাবার মত ক্ষিদে নাই—এত ভাত শুধু শুধু এঁটো করি কেন ?

মায়া বলল—ঠাকুরের প্রসাদ বলে সবাই ভক্তি ভরে, শুদ্ধ মনে খায়। স্বামীর পাতের ভাতও স্ত্রীর কাছেও তাই। তারপর বলল—আচ্ছা সমাজের উন্নতি হচ্ছে, আমরা ও দিক দিয়ে উন্নত হয়েও যেন অবনতির তলায় তলিয়ে রয়েছি। কেন, শিক্ষাতো আমরাই দিয়েছি—মানুষ উপায়ী না হলে, সে স্বাধীন হয় না। যেমন তুমি উপায়ী, আর আমিও উপায় করে বেঁচে থাকতে পারি বলেই, আমাদের সমাজে এখনও এমন এক কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। তবে এটা আমাদের জাতিগত না হয়ে পেশাগত হয়ে রয়েছে বলেই কারো গায়ে লাগেনি। কিন্তু আমি ওটা মনে করি না। মনে হয়, ওটা বাঁচার তাগিদে সব ভুলে বসে আছি।

কুমুদ এক মুঠো ভাত চটকে মুখে তুলে, দুধটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে উঠে পড়ল। তারপর বলল, আচ্ছা তুমি সবই পণ্ডিতী বিদ্যে আওড়াচ্ছ কিন্তু আমি কি বিশ্বাস করব, যে তোমার জীবনে বন্যা হয়ে সর্বনাশ

হোক, আর আমার জীবনে সেই বন্যার পলিতে সবুজ আসুক ? এ-যুগে কে এমন আছে, নিজের সর্বনাশ ডেকে এনে অপরের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে ?

মায়া বলল কেউ করে কিনা, জানি না, তবে আমি তোমার মতে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেও, ক'জনের উপকার করেছি বল। আমার দুগ্ধপোষ্য ভাইবোন বানে ভেসে যাবে, আর আমি স্বামীর ভোগ বিলাসে নিজেকে বলি দেব ? পুণ্য করব ? সেদিন জীবনে না আসে না আসুক। যদি একই সঙ্গে দুটা জিনিষই পেতাম, তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করতাম। আমার কথাগুলো তোমার কাছে খুবই আলগামনে হলেও, একদিন দেখবে, আমিই শক্ত সামর্থ, আর তুমি-ই আলগা মনে আছ। কেউ দেবতার নাম করল কি, না করল, দেবতার কিছু এসে যায় না। কিন্তু অভ্যাস না থাকলে নিজের চিন্তা ভাবনা থাকে না। তখনই মানুষ হয়ে ওঠে চোর, ডাকাত, লম্পট শঠ প্রবঞ্চক। বাতাস আছে বলেই বেঁচে আছি। যদিও তাকে দেখতে পাইনি। আবার আলো আছে বলেই অন্ধকার। তেমনি শুভ আছে বলেই অশুভও পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কুমুদ হাত ধুয়ে এসে বলল বেশ, আমি পুনরায় একজনের স্বামী হই ও ছেলে-মেয়ের বাবা হয়ে সুখী হই—এই কামনা যদি তোমার হয়, তবে বলি তোমারও ভগবান ভাল করুক। কথাটা শেষ করে বলল—দেরী কেন ?—দাও, আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।

মায়া বলল, হ্যাঁ এইযে ভাইটা ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে। গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই ও আবার ঘুমিয়ে পড়বে, বলেই চলে গেল।

কুমুদ বলল—আর মায়া বাড়াও কেন ? আমিতো তোমাকে সেইজন্যে মুক্তি দিতেই এলুম। এবার তোমার কর্তব্য কর। শুধু আমায় ছেড়ে দাও।

মায়া ভাইকে পুনরায় গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসে, সিঁদুর ও আয়না নিয়ে বসল। তারপর বললে জানো, ত্যাগের মত আর শান্তি কিছুতেই নাই। আমি মুক্ত হতে চাইনি, তুমি যখন মুক্তি দিলে, তবে তা নিতেই হয়। কিন্তু আমি জানি সামনে যা কর্তব্য এসে হাজির হয়, তাই করা মানুষের মনুষ্যত্ব।

মাথার সিঁদুর পরা শেষ।

কুমুদ মায়ার দিকে তাকিয়েই ছিল। কিন্তু মায়া যে তাকে সিঁথির

সিঁদুর তুলে নেবার জন্যে মাথা এগিয়ে দিল; কুমুদ খেয়াল করতে পারল না। শেষে মায়াই বলল কই মুক্ত করবে বললে যে ?

কুমুদ ভয় পাওয়া মানুষের মত হঠাৎ চমকে উঠে, তার সিঁথির সিঁদুর নিয়ে বলল, জানি না—মুক্ত করলুম, না আরও মায়ায় জড়িয়ে গেলুম।

তারপর মায়ার সিঁথির সিঁদুরটুকু যত্নসহকারে নিয়ে কুমুদ দুয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

॥ ছয় ॥

দু বছরের মাঠে কাজ ! রায়কর্তা মায়াকে বলে গেল, ওরে মায়া, তোর বাবা দুদিন কাজে লাগবে বলে যায়নি ! এমন কি গরুগুলোর ব্যগাল ঘর গেছে। তাদের মাঠে বের করার জন্যে পর্যন্ত নমঃতুষ্টি করেছিলুম, তাও বাবুর টিকি পাইনি। কি আশ্চর্য্য ! তোদের দেখছি, ছাগল-গরু গোঠে বাঁধা। যাক ওভাবে চলবে কি করে ? গাই দুধ দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ওই পয়সায় কি অতবড় একটা সংসার চলে ? তাই বলছিলুম, কি জানিস তোর বড় ভাইকে স্কুল ছাড়িয়ে আমাদের গরুর বাগালী করতে রাখ। আর তুই নিজে আমার ক্ষেতে খাট। তুইতো তোর বাবার দুর্গা নওমা। সেজেছিস যে, জগৎ-জননী জগদ্ধাত্রী। মায়া মুখ নীচু করে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিল, তারপর বলল—আমিও তাই ভাবছি। তবে জ্যাঠামশাই, ভাই যতদিন পড়বে, ততদিন ওকে পড়াব। ওতে আমি কিন্তু কারও কথা নেবো না।

খগেন রায় বললেন—সাদা মাথার কথা মনে করে, পরে পস্তাবি।

এখনকার মানুষের ধর্মটা কি জানিস—গলায় ভাত আটকে গিয়েছে জল খাও। খেয়ে উঠে খবরদার আর মনে করো না, কে জলটা মুখের সামনে ধরে দিল। হ্যাঁ, যদি ভাবিস পরের ভরসা করিনি, তাহলে বড় কেন, সব কটাকেই তুই স্কুল পাঠাস। মানুষ দেখে শুনে তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। কিন্তু বাবু, ওতে তোর আরও ক্ষিদে বাড়বে। মনে মনে শুধু জ্বলবি। রাগে অভিমানে নিজের গোছা, গোছা চুল নিজের হাতে ছিঁড়বি।

মায়া চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

খগেন বলল—যাক তবে পরের প্রশংসা খাও, আর পেটের জ্বালায় ছটকা-ছটকি কর।

মায়া, তথাপি চুপ! দেখে শুনে খগেন বলল—হ্যাঁ, ঠিকই বটে—সত্য কথা সত্যিই আঁতে ঘা দেয়। পরে কেন দুঃখ পাবি, পস্তাবি তাই কথাটা বলে ফেললুম। যাক, আগামীকাল তাহলে বড় মাঠে চলে যাস।

মায়া মুখে কিছু না বলে, ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

রায় কর্তা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, মেয়েছেলে তুই, যদি কোঁচা গোজা ব্যাটাছেলে হতিস, তবেত ধরাকে সরা জ্ঞান করতিস। হ্যাঁ, দিনের হাওয়া তো—নাম সই করতে শেখা, মন্ত্রীর দিদি না হলেও, নেতার দিদি ছাড়ায় কে? তারপর বলল, —কাকে কি বলি! যারা বিচারস্থলে বসতে জানত নি, তারাই এখন পাঁচজনের মাথা নিচ্ছে। কথা শেষ করে আবার খগেন মুখ ফিরিয়ে হাঁকল, ওগো মায়া, বড় মাঠের পাঁচ বিঘের পড়নে সকাল করে দেখা দিস মা। আর ডাকতে আসতে পারব না। একটু থেমে বললে,—আমি না দেখলেও, পাঁচজন দেখবে ভাইয়েরা বিয়ে করে, কাঁকালে লাথি মেরে পৃথক হয়ে খাচ্ছে। দূর! দূর! যতসব নাবালিকা।—যুগ চেনে না তো! এইভাবে নিজের মনে বক বক করতে করতে বুড়ো আবার মুখ ফিরিয়ে বলল—পান্তা নিয়ে যাস, মায় খোরাকে বার টাকা।

এতক্ষণে মায়া মুখ খুলল। জানি, তোমাদের সোডা মাখানো শোন ফুলো মুড়ি, মুখ ভরলেও পেট ভরেনি। আমার মোটা চালের পান্তাতে মুখ না ভরলেও পেট ভরে, জ্যাঠামশাই। ও খাওয়া তোমাদেরই পোষায়। তোমরা আমাদের কাজ দেখ কিনা, পেট দেখ কি? খগেন বলল—ওঃ, বাবা কার লেজে পাক দিয়েছি! কালনাগিণী ফুঁশ করেই আছে। হুঁ দিন কাল যা পড়েলো, যাকে না শালা বলবে, সেই রাগ করবে। পান্তা ভাতের কথা বলল ঠিকই, কিন্তু মায়া পান্তাভাত মোটেই খেতে পারত না। তাই ও কাক-কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠত। বাসি কাপড় ছেড়ে, ভাত চড়াত। গরীব কড়ার ঘরে জ্বালন বলতে লঙ্কাশির গাছ, শুকনো আঁকড় আর কাঁটা গাছ এবং লোকের গাছের ঝরে পড়া শুকনো পাতা। উনানের মুখ থেকে উঠতে পারত না, তাই জ্বালন ঠেলতে ঠেলতে হাঁকতো, জয়া ওঠ, নাতা ধর। কিন্তু বর্ষার সেই সকালে, তার উপর যদি ঝিম্ ঝিম্ করে বাদলা হয়, তবে জয়া যেন বিছানা কামড়ে পড়ে থাকে। দোষ কি তার। ছোট

ভাইটাকে ট্যাঁকে করে করে চব্বিশ ঘণ্টা চরকির মত চারদিক ছোটে। ঐ নিয়ে গরু ছাগলের খাবার করে, তাদের মাঠে দিয়ে আসে। জগু বে-রাস্তায় গেলে, তাকে ফেরাতে হয়। দোকান করে, চাল আনে, জল তোলে। কোন ঘরে শাক ডাঁটা পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে, খোসামোদ করে, কখনও ওর জন্যে বেগার খাটে। কখনও কখনও দিদির কথামত এর তার পুকুর যায়। শুর্জনি শাক বা কলমি শাকের জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখে পুকুর পরিস্কার। কোনকালে শুর্জনি, কলমি ছিল, যেন আজ আর কারও মনে নাই। কারণ মাছের চাষে বাবুদের বড় লাভ। টাকার খেলায় মেতেছে মানুষ। যদি মানুষের দেহটাও টাকার হতো, তবে মনে হয়, সে ধন্য হোত।—নির্জীব, ছিঁড়ে যাবে, পুড়ে যাবে, কিংবা হাওয়ায় উড়ে যাবে, তাতেও তাদের ভ্রুক্ষেপ থাকে না। হায় গরীব, শাকে বাড়ায় মল। তোমার পাইখানা নাই পরিস্কার হোক, তুমি গ্যাস্ট্রিকে মর। বাবুদের চিন্তা কি। টাকা থাকলে ডাক্তার, তারপর কত রকম ঔষধ। না হয় টাকা দেখে দেখে, জীবনের বাকী কটা দিনগুলো বেশ চলে যায়।

যখন জয়া খালি হাতে গিয়ে চোরটির মতো মুখ খাবার ভয়ে, ভয় ভয় করে দাঁড়ায়, তখন বলে—শাক কই, খালি হাতে যে ?

জয়া উত্তর দেয় শাকতো দূরের কথা, শাকের গন্ধ পর্যন্ত কোথাও নেই।

মায়া তেড়ে আসে—কেন হালদার দীঘিতে ?

জয়া হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাণিক উঠে এসে বলে না গো দিদি—দীঘি পরিস্কার, জল সব সময় তিরতির করছে। মায়া বলল কেন মায়াবী দীঘি ?

জয়া বললে—গিয়ে দেখে আসবি—কেমন একটা সবুজের চিহ্ন চোখে পড়ে। দেখিস তুই, আর কখনও শাক তুলতে যাবো না। মায়া এবার তেড়ে এলো, কেন দুটো গেঁড়িও পেলিনি ?

জয়া কি আর করে, নাকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়লো দিদির শাসনে। ভাত হয়ে গেছে। বোনের আশার পথ চেয়ে শুধু ভাত টিপে টিপে দেখছে! কিন্তু, আবার সেই খালি হাত। মায়াও আর ধৈর্য্য ধরতে পারেনি। জ্বালন ঠেলা পোড়া কাঠিটা নিয়েই ছুটে গেল জয়ার দিকে। মুখ পুড়ি, হতচ্ছাড়ি, দুটো গেঁড়ি তুলে আনার গতর নাই, গেলনটা হবে কি করে ? কে খাওয়াবে তোদের ?

মাণিক, সত্যিই, সাত রাজার ধন এক মাণিক। এসে বাধা দিয়ে

বলল—ওকে কেন যে তুমি তেড়ে তেড়ে মারতে যাচ্ছ, তার ঠিক নাই। এখন চুক্তি করে পুকুর চাষ হয়। তাই একজনের মাছ চাষ শেষ হলেই অপরজন মোয়া খোল দিয়ে, পুকুর গাবায়। তখন পুকুরের গেঁড়িটাও মরে ভেসে ওঠে।

হুঁ, প্রাকৃতিক নিয়মের বদল, বাবুরা পুকুরের মাছ খায়, গরীবদের ভাগ গেঁড়িতে। কিন্তু সে রামও নাই, আর অযোধ্যাও নাই। ঈশ্বরের দেওয়া ভোগই, ভোগ। মানুষের সৃষ্টি আমাদের অসুখ। কিন্তু মানুষ-ই যে আজ ঈশ্বর সেজেছে।

আমাদের চিন্তা আমরা কি করে বাঁচব—হা—ঈশ্বর! শেষ করে মায়া পূর্বের চিন্তায় ফিরে এল। এখন বোনের উপর রাগের ভাঁটা পড়লেও ভাই-এর উপর ভাঁটার মত চোখ করে বললে, তুই কি জমিদার, না রেডিও? সব খবর তোর কাছে। কোমরে হাত দিয়ে দেখিস দুবেলা মনে হচ্ছে? মানিক বলল—সবই চোখে দেখেছি, তাই বলছি।

মায়া বলল—স্কুল যাস, তার পবত ঘরে। তবে অত দেখিস কি করে?

মাণিক বলল—দেখবার ইচ্ছে থাকলে সব কিছু দেখা যায়।

মায়া চোখ করে বলল—ওঃ আচ্ছা। স্কুলের নামে তবে ফোপর দালালী করে বেড়ানো হয়? এবার পরীক্ষার চাঁদার কথা বলিস একবার!

মাণিক আর কোন প্রতিবাদ না করে, বই নিয়ে গুনগুন করতে থাকে।

কালু ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মায়া হাঁকল, জয়া, ও কানে কালা, কালু উঠে কাঁদছে যে! জয়া কালুকে কোলে তুলে চেঁছিয়ে উঠল—হায়রে দিদি হিসি করে ফেলেছে!

মায়া চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে রোজ বলে দিতে হবে কেন, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওকে তুলে আনবি। কি করে বিছানা কাঁথা শুকনো হয় দেখি শোবার সময় দেখবো!

জয়া বলল না, দিদি হিসি করতে এই সুরু করেছিল, যাই হোক তুলে দাঁড় করিয়েছি।

ফ্যান গালতে গালতে মায়া বলল—একেবারে ছবিকে তুলে আন।

জয়া হাঁকল—তোমার আদরের বোন, তোমার কোলছাড়া উঠবেনি। দেখবে এসো কেমন মিটিমিটি করে তাকাচ্ছে।

মায়া আনন্দে গদগদ হয়ে ঝটপট করে ফ্যান গেলে ঘর ঢুকে ছোট

বোনকে কোলে তুলে চুমু খেতে খেতে দৌড়ে গেল উঠানে। চল দিদি, দেখি শাক পাতা পাই নাকি?—ভাত খাবি কি দিয়ে? বলে আবার চুমু।

ছবিও আহ্লাদে দিদির বুকে মুখ লুকায়। দুটো লাল নোটে শাক সবেমাত্র চার পাতা ফেলে দাঁড়িয়েছে। তারই দুটো করে পাতা তুলে মুড়ো কুমড়ো গাছটার দিকে হাত বাড়াল।

জয়া হাঁকল দিদি এবার আর কুমড়ো খেতে হবেনি, যখন দুবেলা চাল জুটবেনি, তখনও কুমড়োর ছেঁচকি আর রুটি।

মায়া তথাপি কোন কথা না বলে ওরই মধ্যে কটা কুমড়ো পাতার সঙ্গে একটা ডগও ছিঁড়ে নিল।

জয়া চেঁচিয়ে উঠল, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠিতে জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখিস-নিতো? আচ্ছা পাকা তালের সময় রাতে উঠর ভেবেছিস।

মায়া বলল হতচ্ছাড়ি, তুই আমি নাই আলু টিকুনে চাল-ভাতে ভাত খেয়ে উঠলুম, ভাই তিনটে বোন দুটো? তারপর বলল। হুঁ পাকা তাল? দেখগে যা, বড়লোকের চাকরেরা দুপুরে গাঁতা করে গাছকে গাছ সাবাড় করছে। কি দিন এলো দিদি, আমাদের যেই নাইকে, সেই-নাই। মায়ার শাক কাটা, ধোয়া সারা। এখন কড়াইএ তুলে নুন হলুদ দিয়ে ঢাকা দিয়ে, কালু ও ছবির চোখে জল দিয়ে বাসি রুটি হাতে দিয়ে নিজেও টিনের জামবাটীতে ভাত, আলুভাতে সাজিয়ে, শাক সিদ্ধটা একটু তেলের উপর একটা শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে সাঁতলে কড়াই থেকে একটু খুন্তিতে করে তুলে নিজের থালায় নিয়ে হাঁকল,— জয়া, শাক ঘণ্টটা নামা, আমি মাঠে চললুম। ছিঃছিঃ, গোনা কাকা কালদা, যামিনী খুড়ো কখন কাজে চলে গেছে।

জমিতে গিয়ে দেখল সবাই বিড়ি ফুঁকে সবেমাত্র বীজ ভেঙ্গে হাতা আঁটি করেছে।

খগেন রায় বলল, দেখ ঝিউড়ি গিন্নি সংসার গুছিয়ে দেরী করে কাজে এসেছে, খগেন রায়কে ধনী করতে।

যামিনী খগেনকে বলল, সত্যই খুড়ো ঝিউড়ি-না বউ চেনা দায়। পারেও বলতে হবে। আজ কালকার মেয়েরা ওর কাছে হার মানবে। ধনী ঘরের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের মত গরীব ঘরের বললেও কোন ভুল হবে না। ছোট ছেলেরা যেমন চৈত্র বৈশাখে জলে ঝাঁপাই ঝাড়ে, ও তাই সকাল দুপুর বিকাল, কোথায় গরু, কোথায় ছাগল, কোথায় ভাইবোনেরা,

কে স্কুল গেল, কে খেয়েছে কে ঘুমিয়েছে, সব ব্যাপারে চব্বিশ ঘণ্টা কি একতিল বসে থাকে !

খগেন বলল—চুপ কর, চুপ কর। বাপের ঘর বলে এত গুছাচ্ছে। শ্বশুর ঘর হলে দেখতিস, কত কথা কানে আসত।

তুই-ই তখন বলে বেড়াতিস, মায়ার জন্য আমাদের পাড়া পড়শির পর্যন্ত মাথা কাটা গেল। ছাড় বাবু ছাড়, ওসব লোক দেখানো !

মায়া বলল জ্যাঠামশাই, গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।

॥ সাত ॥

সেই মাত্র মলতী গরুকটা গোয়াল থেকে বের করে, অনেক দিনের পর মায়ার কাছে এসে বসল। তারপর মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখে নিজেও আবাক হোল। মাথায় চুলে তেল নাই-জট পাকায়নি এইমাত্র। সিঁথের সিঁদুরের গন্ধ নাই। চোখে মুখে এক দুর্জয় দুরন্তপনা মনে হয়। সে যেন এই বিশ্বসংসারে কাউকে পরোয়া করেনা। ভাবে গম্ভীর, মনোবলে সে যেন এক নতুন মানুষ। সব মিলিয়ে ওকে মনে হোল, যেন ধ্যানমগ্না এক যোগিনী। মালতী কোন কিছু না বলে কড়াই-এর দিকে তাকিয়ে দেখল, আলুগলো ছ্যাঁকপোড়া হয়ে গেছে। পোড়া গন্ধ উঠেনি তখনও। এতক্ষণে মালতীর দিশে হোল। মায়া কি এক চিন্তায় রান্নার খোঁজটাও রাখে না। হাতের খুন্তি হাতে, মন নেই রান্নায়। ডুবে আছে অজানা, অচেনা এক চিন্তায়। মালতী বলল কিরে মা, কি এত চিন্তা করিস ? কড়াই পুড়ে আলু চুঁয়ে গেল !

মায়া ভূত দেখার মত চমকে উঠে মালতীকে দেখল মাত্র। কিছু না বলে আলুগুলো খুন্তিতে নেড়ে দিয়ে হড় হড় করে জল ঢেলে দিল। তারপর মালতীকে বলল, সত্যই বড় মা, করছিতো একটু আলুর চড়চড়ি। তাও চুঁইয়ে বসে ছিলুম। ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছিলে। বলে কড়াইয়ে ডিস ঢাকা দিয়ে দিল।

মালতী বলল, ভিটেয় পা দিয়ে থেকে আসি আসি করছি, কিন্তু আসতে আর পারিনি। তারপর এসে পৌঁছেছিতো তিনসন্ধ্যায়। সে যাক, হ্যাঁরে, সেদিনও তোকে এরকম আর আজ দেখছি অন্যরকম। মাথায় তেল নাই, চোখের কোলে কালি না পড়লেও মুখ চোখের অন্যভাব।

শুনলুম, নিজেই খাটতে বের হচ্ছিস আজকাল।

সিঁথির সিঁদুরটাও দিতেও সময় নাই—শ্বশুরের কানে উঠবে নিতো? হ্যাঁরে মা সিঁদুর কোথায়, সিঁদুর!—বিয়ের পর সিঁথেয় সিঁদুর না দেখলে বড্ড নেড়া বুচি মনে হয়। নিজেরই অমঙ্গল—তারউপর জামাই ভাববে কি?

মায়া বলল—যে একদিন সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে ছিল সে-ই যদি সিঁদুর তুলে নিয়ে যায়, আমার কি করার আছে জ্যাঠাইমা। আমার কপাল!—তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বলল, বিধাতা অদৃষ্টে যা লিখে দেন, তাইত হয়।

মালতী যেন আকাশ থেকে পড়ল—কি কি বললি, কুমুদ ফের বিয়ে করেছে? কেন কিসে তুই কম?—কাজে, না কর্তব্যে, না কথায়, না দেহে, না মনে? মা না হয়ে, যে মাকে হার মানায়, তার কপালে এই দুর্ভোগ! একি সৃষ্টির বিধান, না মানুষের মন গড়া?

মায়া বলল—না জ্যেঠি, এটাই ভগবানের বিধান। কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়। আমি যে আমার দুগ্ধপোষ্য ভাই বোন গুলোকে লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছি, বড় নাম। কিন্তু ভগবান তা সহ্য করবে কেন? তাইত স্বামী আমার বৈরী।

মালতী বলল—মায়ের পেটের ভাই বোন, তাদের মানুষ করা কি মহাপাপ?—যে কুমুদ তা অস্বীকার করল।

মায়া বলল—আমি যদি ভাইবোনদের মানুষ করব, তবে তার সেবা করব কখন? সময়ের সুখ, সময়ে যদি না মেলে তবে সে সুখের দাম কি জ্যেঠি?

মালতী বল—কি, আগের কর্তব্য আগে নয়? কেন, সে অবুঝটাকে বুঝিয়ে বলিসনি?

মায়া বলল—বলিনি আবার। বললুম তুমিও এস, ওদের আত্মীয় তুমি। ওদের মানুষ করা তোমারও কর্তব্য। তারপর ওরা বড় হলে তোমার সংসারেই দুজনেই ফিরে যাব।

মালতী বলল—ঠিকইত বলেছিলিরে মা তাতে সে কি বলল?

মায়া বলল—জ্যেঠি, তাতে তার কি এসে যায়। বলল, জীবনে সুযোগ একবারই আসে।

মালতী বলল—সুযোগ! কেন, তাকে তুই স্বামীর মত দেখতিস নি? আমরাই কি তাই চাইতুম? যত সব ছোট মনের মানুষ।

মায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—তাই তাকে বুঝিয়ে ছিলুম আমি যদি কর্তব্যপরায়না হই, তবে আমার কথায়, কাজে, চলা ফেরায় ফুটে উঠবে।

মালতী বলল—ঠিকই বলেছিলি। কি উত্তর করলে? মায়া খুবই মনমরা হয়ে বলল কি জানি, কি যে ভাবল সেই জানে কথাটা কানেই নিলে না।

মালতী বলল—ও, বুঝেছি। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, তোর ভাই বোনদের আপন ভাবছিস, আর তাকে পিছে ফেলছিস। ছিঃ! ছিঃ! এযে বাঁধন নয় কবন্ধ! তাহোকরে মানুষ কেন আর কর্তব্যপরায়ন হয়নি জানিস? শুধু এই জন্যই-মানুষ আগের কাজ আগে করেনি। স্বার্থ-কেই সব সময় বড় করে দেখে। তারপর বলল, সে যাক, অশিক্ষিত গরীব কড়ার মেয়ে তুই, যৌবনকে ধরে রেখে জীবনে বাঁচবি কি করে?

মায়া বলল—না জ্যেঠি, ও চিন্তা আমি করিনি। ও চিন্তা যদি মনে থাকত, তবে স্বামীর হাত ধরে তারই সংসারের ফিরে যেতাম। এখন চিন্তা এতগুলো প্রাণীকে বাঁচাব কি করে? এই যে, এই সংসারাটা—বলেই ভাই বোনদের দিকে ইঙ্গীত করল। মালতী হতবাক হয়ে শুনছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। এবার বলল—যার মনে ভয় আছে ও তার সঙ্গে একাগ্রতা রয়েছে, সে যে কোন কাজে জয়ী হয়। তাই তোর সাধনা সিদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে কি জানিস—ও সিদ্ধিলাভের দাম কি থাকবে? এ যে গরীর কড়ার সংসার, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা নাই। শেষে হবে কি জানিস, যার জন্য করলি চুরি সেই বলবে চোর। এইভাবে জীবনটা মাটি করিবি মা।

মায়া হাসতে হাসতে বলল—জ্যেঠি, আমার জীবনকে বাজিয়ে দেখে নিয়েছি। তবেই আমি আজের বাজনদার। সুখ শান্তি এক সঙ্গে কে পেয়েছে? সবাই একটা নয় একটার প্রত্যাশী।

তারপর বলল—সহ্য করা নারীর সব চেয়ে বড় ধর্ম। কিন্তু সহ্য আসবে কোথা থেকে? যে সবাইকে চেনেনি, তার মধ্যে সবাই এর সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার ছাপ পড়বে কি করে? যার মধ্যে সহযোগিতা না এলো তার আবার সহ্যগুণ আসেনি। সুখ আমার মধ্যে নাই আসুক, কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করেছি, বলেতো শান্তি পাব। তাই যখন শান্তি থাকবে তখন দুঃখের ভার সেই সময়ের জন্য অন্ততঃ মন থেকে সরিয়ে সুখ পাব। আর যদি না পাই তবে কর্তব্য করেছি বলে মাথা

ধরে বসে থাকব।

মালতী বলল, না মাথা ধরে বসে থাকতে হবে নি। যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। কর্তব্যের কি শেষ আছে? যারা পথ চলে তাদের পথের কি শেষ আছে? যারা জানতে চায়, তাদের কি জানার জিনিষ শেষ হয়ে যায়?—অজানা তখন চতুর্দিক দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিছুরই শেষ নাই। আমরাই শুধু শেষ হয়ে যাই।

মায়া বলল—ঠিকই জ্যেঠি, দিন বদলেছে, মানুষও বদলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মান-মর্য্যাদা ইজ্জত শেষ করে দিচ্ছে। স্বামী সুখে আমি নাই বোষ্টমী। কিন্তু যারা স্বামীকে বোষ্টম সাজায়, তারাও তো স্বামীর কাছে বোষ্টমী। সিঁথেয় ঐ লাল ডোরাটুকু দেখিয়ে কেষ্টলীলায় মাতায় বড় রকমের ছুতো। আমাদের দেখা আশা-দিদিমণি স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়ায়। তাদের মনে জ্ঞানের বাতী জ্বালে। আর নিজ রূপের বাতী জ্বালিয়ে কত, নিশাচরকে বশ করছে বলত? স্বামী ব্যাঙ্কে কাজ করে, টাকা ব্যবসায় টাকা—বহুটাকা মাইনে নিয়ে স্ত্রীর মত রাতের বিনোদিনী খুঁজে বেড়ায়।

সুখই বল আর শান্তিই বল, আর মুখসই বল, বিয়ে যদি না করত, আরও কতকে কত কি বলত। উভয়েই চুপ। একটু পরে আবার আরম্ভ করল—

লতা দিদিমণি স্কুলে পড়ায়, কলেজও গিয়ে নাকি পড়িয়ে আসে। অপারেটর স্বামীকে তার পছন্দ হয় না। রাতে শুনি মোরগ লড়াই হয় গায়ে আছে দাদ। টাকার কম নয়, মলম মেখে ঢেকে রাখে। কিন্তু জানে কি? যখন সারাগায়ে দাদে ভরে যাবে, তখন তার ঘর ছাড়া আর গতি নাই। খসে খসে যখন পড়বে, তখন পাপের কথা মনে পড়বে এবং অনুতাপই তার মুক্তির পথ।

মালতী বলল—হ্যাঁ মা, যা বলেছিস, ছোট ছেলে যখন নিজে খেতে শেখে, তখন মায়ের কোলের চিন্তা আর তত বেশী করে না। সে তখন এ কোল ও কোল ঝাঁপাই ঝুড়ে। তারপর যখন বড় হয়ে উপায়টাও করতে শেখে, তখন কে মা মনে করতে চায় না। তাই পেটের চিন্তা যার হয়ে গেল, সে ভাবে আমি কত বাহাদুর। কিন্তু তার বাহাদুরীটা যে সবাইকে খাইয়ে নিজে খাওয়া, তার আর জ্ঞান থাকে না। তবে অবুঝ, আহাম্মুখ কাকে বলবে! জানা উচিত খেতে দিলে, খেতে পাবে।

মায়া বলল—এবার বল, আমার কথা কিন্তু সেই একটিই। হয় আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেছে, নয়ত আমি তাকে স্বার্থের ভাগ দিইনি। আর আমি এ-ও জানি যে, বাঁচার তাগিদে স্বার্থ আসে। কারণ তখন যে সে ভাবে অমর হলে আমি একাই হব।

মালাতী বলল—তবে। স্বার্থ কে শেখাল ? বাঁচার রাস্তা।

পেট বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায়, আহার কম। তাই পেটের চেয়ে পকেটের দিকে বেশী নজর দেয়। এরাই স্বভাবে মশা, দেখেছিস মশা রক্ত খায়। কিন্তু এমন খায়, সেই খাওয়াই শেষ খাওয়া। পেট ফেটে মরে।

মায়া বলল হ্যাঁ জ্যেঠি। ওদের মধ্যে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর কোন বিচার নাই। কঞ্জুষ হলেই হয়। কিন্তু লতা দিদিমণির মত যারা মলম দিয়ে দাদ ঢাকা দেয়, এরই বেশী মানুষের শত্রু। মানুষ চাকচিক্য দেখাতে গিয়ে, বাঁচার রাস্তাকে ওজন করে দেখছে। এক কথায় বাঁচব,—বাঁচার উপায়ের চেয়ে, বাঁচব মনের উপর এই চাপই মানুষের বিবেকের সর্বনাশ ঘটায়। তখন হাত কাজ করে না। মনে লোভের আর শেষ থাকে না। এবার হাত বাড়ায় চুরি ডাকাতী লুট করার জন্য। নয়ত মন হিংসায় ভরে ওঠে—

অপরকে দিয়ে নিজের পথ করে নেয়। তাই নিজের সঙ্গে অপরকেও খারাপ রাস্তায় নামিয়ে, হিংসাকে বাঁচার রাস্তা করে নিচ্ছে। এ-কি অনাচার! আমিও শান্তি পাব না, তোমাকেও শান্তিতে বাস করতে দেব না। আসল কথা, অশান্তিই ওদের শান্তি। আর যারা শান্তি চায়, তারা চোখ কানের মাথা খেয়ে বুলবুল পাখীর মত দেখছে। তারপর সুখের কথায়, তারা জানে শিশুকালে মায়ের কোলে যেমন সুখ, অবলা হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকার মত যৌবনের ভাবনায় তখন ব্যাকুল। তাই মৌমাছির মত মধু খায়। কিন্তু মধু যে তাকেই এনে জমা করতে হয়—তা জানে না। আসল কথা প্রেম, প্রীতি ওদের কাছে শরতের আকাশে আলোর রঙ্গিনী-রূপের মত ছিনিমিনি খেলা। তাই এত পোষাকের বাহার! ধিক লালসাকে। যার মধ্যে কোন সৃষ্টি নাই, সেতো নুড়ি পাথর হতে পারে। কবে হোল কবে ভেঙ্গে গেল, কবে নদীগর্ভে গড়িয়ে গড়িয়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়। এবার কিন্তু জমি গড়ে সমভূমিতে পলি হয়ে সবুজের রূপ নিয়ে আহার হয়।

কিন্তু সেকি জানে—তার শেষ পরিণতি সকলের স্বার্থে।

এটা যদি মানুষ প্রথমেই জেনে নিত, তবেতো তার বাস্তব বুদ্ধির ভগ্নাংশ থাকত। কিন্তু যখন তার এই জ্ঞান হয়, তখন তার আর ফিরে তাকানোর সময় থাকে না। বাস্তব ও অবাস্তবতার মধ্যে যে সব হারিয়ে ফেলে। মন চায়, সংশোধনের জন্য তাই জন্ম জন্ম তাকে যাওয়া আসা করতে হয়।

মালতী বলল—মায়ের কাছে অনেক কিছুই শিখেছিস, এটা কি শিখেছিস?—মানুষ আজ জানে কি এ জমের কথা। পরজন্মে মনে থাকবে? তাই যে ভাবে হোক, আরাম করে পেট ভরায় আর রং বে-রঙের খেলা দেখিয়ে প্রজাপতি হয়ে, এফুল ওফুলে মধু খেয়ে বেড়াও। সামান্য কটা দিনের জীবনকে ভরপুর করে চলে যাও। দূর মা, কে ভাবে আজ আর জাতীস্মরের কথা। কে চিন্তা করে, আমরা পৃথিবীতে আসি পাপ স্খলনের জন্য।

মায়া বলল—চাকা ঘোরে। তাই গাড়ি এগিয়ে চলে। কিন্তু গোল চাকার সব জায়গায় সমান ধকল হয় না। কোথাও পাথর, আবার কোথাও নরম মাটি। এভাবে চাকার, কোথাও না কোথাও ভাঙে। বদলাবে? কিন্তু যখন সব শেষ হতে বসে, তখন তার কে আর মূল্য দেয়? জ্যেঠি, আশা দিদিমণির মনোভাব এই যে, কে কি বলল অত দেখার দরকার নাই। জীবনের কটা দিন হেসে নেচে, কেঁদো-কেঁদে করে চলে যাব—অথর্বের সময় জমানো টাকা আছে। কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত এ শিক্ষাই যে ছাত্র ছাত্রীকে দিয়েছি। একদিন দেখবে, দু-দিন দেখবে, তিনদিনের দিন সব নিয়ে সরে পড়বে।

তাই যে চাকচিক্য দেখিয়ে, যা করা উচিত ছিল, করল না। শুধু ঘর জামাইয়ে থাকার পরনিন্দার জন্য যৌবনের সুখে কাঁটা পড়ার ভয়ে যে স্বামী আমাকে ত্যাগ করে গেল, তোমাকে বলে রাখছি, আমি যদি তাকে মনেপ্রাণে ভালবেসে মনের আসরে বসিয়ে রাখি ও আমার কর্তব্য, ভাই বোনদের মানুষ করে ওদের সুখ দেখি, তবে আমার সুখের অভাবকি? আর ঐ স্বামীকে আমার কাছে আমাকে স্ত্রী বলে দাঁড়াতেই হবে। না হলে এই হলুদ সুতোর বন্ধনের মূল্য থাকত না।

মালতী বলল—যাক মা, আমি, তারপর বলল—শুধু আমি কেন, আমাদের এই বাড়ী গোষ্টিটা পরনিন্দার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

মায়া হো হো করে হেসে উঠল,—জ্যেঠি, পুরুষের মনোভাব পেয়েছি। কিন্তু যেদিন পুরুষ হয়ে মেয়ের কাজ করব। সেদিন দেখবে, কে বলে নারী। অসহায়!—এটা ওদের মনের অভাব—কাজের গতির ব্যাঘাত! হাসলে জ্যেঠি হাসলে। আমি যৌবনের পিছনে ছুটি, না যৌবন আমার পিছনে ছুটে।

॥ আট ॥

কি মায়ায় পড়লি তুই মায়া, রায় কর্তার ক্ষেত ছাড়া কি আর কারও কাজ নাই, না রায় কর্তা তোকে বেশী টাকা দেবে বলে কবুল করে? বলেই রূপা মায়ার দিকে তাকাল।

গঙ্গা বলল—ওঃ, সেদিকে রায় কর্তা যাইহোক, গিন্নীর দু-হাতে দুমুঠো, আমরাও অনেক করেছি, কিন্তু গিন্নীর মনে ধরেনি। দরকার নাই অমন খুঁত-খুঁতে মানুষের কাজ করা।

রূপা বলল—না, না, ছুঁচিবাঈ ঝাঁটা মার, অমন মানুষের ক্ষেতে গতর খাটাতে, গতর থাকলে অমন কত কাজ মিলবে।

মায়া গঙ্গাকে বলল, বৌদি তোদের যেটা সোজা, সেটা আমার কাছে উল্টো। ঘরের পাশে জমি, সকাল সকাল এসে লাগি দরকার মত উঠে গিয়ে ঘরটাও দেখে আসি, আবার কখনও কখনও গরু বাছুরকে খড় বিচুলিও কেটে দিই, জল দেখাই।

গঙ্গা বলল বুঝতে পেরেছি, ঐ জন্যই তুই রায় কতার লাগপৈঠা।

বেশ কর। তারপর বলল গিন্নী জানে?

মায়া বলল, তাকেও বশ করতে হয়েছে, দৈনিক তার গাইটিকে এক থলি ঘাস কেটে মুখের কাছে ধরে দিই, কর্তার অসাক্ষাতে মেয়ের ঘরে মন মন ধান পৌঁছে দিই,

গঙ্গা বলল—কি রকম? কি রকম?

রূপা বলল—না, অমন কুৎসিত কাল মেয়েকে রাজপুত্তুর বিয়ে করে নিয়ে যাবে। যাক বৌ-এর ভাগ্যে ছোঁড়ার দিব্যি চলছে,—বুঝলি সবই বরাত!

গঙ্গা বলল জামাই কি করে?

মায়া বলল ঐ যে বুলে বামুনের খাতাসারে।

গঙ্গা বলল—হ্যাঁ দিদি, তুই দেখছি বরের ঘরের পিসী আর মেয়ের ঘরের মাসী হয়ে চালাচ্ছিস। মায়া বলল কি করব। গতর থাকতে বুদ্ধি থাকতে সংসারটা উপোষ দেয় কেন? দেখি কত দিন চালিয়ে নিয়ে যাই।

গঙ্গা বলল—ওগো রূপা আয়, আমাদের এখনও আধঘণ্টা গেলে তবে জমি। তখনকে ও আধটা মুজুরের কাজ করে ফেলবে।

রূপা বলল,—অমনি রায় কর্তা ওকে আদর করে বলবে—মায়ি. বলেই ওরা চলে গেল।

সকালে বিড়ি লণ্ঠন নিয়ে রায় কর্তা মায়াকে বলল হ্যাঁগো মায়া, বীজ বাঁধার জুন ঘাস এনেছিসতো? আমিত আনিনি।

মায়া বলল—হ্যাঁ। তারপর বলল তুমি জুন ঘাস পাবে কোথায়? আমি ঐ বসন্ত ঘোষের পুকুর পাড় থেকে কেটে এনেছি।

খগেন বলল লক্ষ্মী মেয়ে তুই মা। তারপর বলল, কাছে বললে খোসামোদ—তুই যে থেকে আমার ক্ষেতে খাটতে লেগেছিস, সেদিন থেকে আমার চোখে ঘুম আসে। জানি আমার মায়া আছে, বলতে বলতে এগিয়ে এসে দেখেই বলল বাব্বা! ও মায়ি, তুই বুঝি এরই মধ্যে পাঁচ আঁটি বীজ টেনে ফেলেছিস?

মায়া বলল—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই যামিনী খুড়ো, শ্যামদা এসে পেঁছাতে পেঁছাতে গণ্ডা তিনেক টানব।

খগেন বলল—হ্যাঁ তুইও বাঁচ, আমাকেও বাঁচা মা। ছেলে দুটো কলেজে পড়ে, মেয়েটা শ্বশুর ঘরে। জামাইকে বলি—তুমি থাক, এসে বেশত, রাতে না থাক দিনে থেকে কাজগুলো দেখা শোনা কর। বুলে বামুন যা টাকা দেয় তার চতুর্গুণ টাকা এখান থেকে পেয়ে যাবে।

কিন্তু তেমন কি বরাত মা আমার, কথা কানে করেনি।

মায়া বলল—সবাইত সমান নয়।

খগেন বলল—আর কেন বলিস মা। তোর জ্যাঠাইমাকে বলি, দেখ পেটের দায়ে তোমার ঘরে খাটে। তাদের ছুঁই ছুঁই দুই দুই কোরনি।

দূর দূর। দোকান থেকে কিনে আনা তেলের বোতলটা পর্য্যন্ত ঘাটে গিয়ে ডুবিয়ে আনে। দৈনিক অতক্ষণ ধরে কোন ঠাকুরের যে পিণ্ডি দেয়, জানিনি,। ঐ সময়টুকুই সংসারটা একটু শান্তিতে জুড়ায়।

মায়া বলল না, না। জ্যাঠাইমাকে আমি কি জানি? যে তার সম্বন্ধে চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে যাব। বলছি সব ছেলেত সমান বুদ্ধি ধরেনি। খগেন বলল না, মায়া না। সবই ঐ গিন্নীর জন্য বিগড়ে গেছে। কি

ভাবি জানিস, আমিত লাঠি ঠুকে ঠুকে কাটিয়ে দিলুম, ছেলে বউ নিয়ে কি করে সামলাবি সামলা !

মায়া বলল—আমি যদি আমার সংসার সামলাতে পারলুম নি, তবে অপরের সংসারে কেন নজর দিই জ্যাঠামশাই ।

খগেন গালে হাত দিয়ে বসল । চারদিক জলে থৈ থৈ করছে ।

গতরাতে আষাঢ়ের মুষলধারে বৃষ্টিই হয়েছে । সকালে ব্যাঙের গাঁ্যাওর গাঁ্যাও শব্দে চারদিক ঝালাপালা করে তুলছে । মাঝে মাঝে দক্ষিণে হাওয়া বইছে । জলের হিল্লোলের সঙ্গে সময় সময় গা কাঁটা দিচ্ছে ।

মাঠে শামুক কুড়োতে বের হয়েছে ছেলে মেয়ের দল । হাতে চুপড়ি, ডিস, কিংবা গামছা। খল খল, গদ গদ, শব্দে জল উঁচু থেকে নীচে নামছে, মেয়েরা চাটুনী জাল পেতে পুঁটি মাছ ধরছে । বড়রা মোহান বাঁধছে । কেউ কেউ ঘুনি পাঁঙ্ বসাচ্ছে । মাঠে লাঙ্গল এখনও বের হয়নি । কারণ ভাসা জল । আজ আর কাউকে কোঁদাল কাঁধে বের হতে দেখা যায়নি । কারণ জমি থেকে অধিক জল বেরিয়ে গেলেই মঙ্গল আকাশ এখনও বেশ পরিষ্কার । সাদা বক সারে সারে উড়ে চলেছে । শঙ্খ চিল ট্যাঁ, ট্যাঁ শব্দে কাঁকড়া, মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে ।

সেই অথৈ পরিবেশে মায়া চিন্তা করে থৈ পেয়েছে । কিন্তু বুড়ো রায় কর্তাকে অথৈ চিন্তায় ফেলে শুধু তার উত্তরের অপেক্ষায় ঘন ঘন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে । রায় কর্তা ঘাড় গুঁজে বসেছিল, ওঠার আর তার নাম নাই । কিন্তু কিছুক্ষণ পর কি যে চিন্তা মাথায় এলো, সে-ই জানে । একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁরে মায়া তুই বা চালাবি কি করে । জমিতো কিছু ভাগে চাষ করতে পারিস ?

মায়া বলল—কার জমি, কে দেবে ?

রায় কর্তা উঠে দাঁড়াল । তারপর বলল । ধর আমিই তোকে যদি চাষ করতে জমি দিই ?

মায়া বলল—কিন্তু জ্যাঠাইমা ?

রায় কর্তা ছাতাটা ফেলে লাঠিটা খেলিয়ে বলল, সবাই জ্যাঠাইমাকে ভয় করবি—বলি সংসারটা চালায় ঐ ছুঁক ছুঁকে গিন্নী, না এই রায়কর্তা ।

দ্যাখ মায়া, আমি বলে দিলুম ঐ গা জ্বালানী কথাটা আমাকে আর শোনাস নি । এইতো মন গরম করে বেরিয়েছি ।

মায়া বলল—কি জানি, এতদিনত জেনে এসেছি, তোদের সংসারে

মেয়ে কর্তা।

খগেন আরও রেগে গিয়ে বলল মেয়ে কর্তা!

শোন, আমি এই বীজে কাঠি পুঁতে দিয়ে গেলুম। এই বীজ টেনে আমার ঐ আড়াই বিঘার কাঁদিটা তুই ধান রুইবি। জানব লাঙ্গল দিয়ে তোর আমি জ্যাঠামশায়ের কাজই করেছি। তারপর তাচ্ছিল্যভরে বলল, ছেলেরা কলেজে পড়ে মানুষ হবে। দেখগে, সিনেমা থিয়েটারের একটা বইও বাদ যায়নি। এদিকে বুড়ো বাপ রাত নাই, দিন নাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা পাঠাচ্ছে। নে বাবু, কত মানুষ হোবি হ। নিজেরা বুজে সুজে চল।

আমি আর পারছিনি, বলেই বুড়ো সত্যই গোঁজ পুঁতে দিল।

মায়া বলল—ওতে আরও অশান্তি বাড়বে।

খগেন বলল—দেখ বেটী, সাময়িক অশান্তি থাকলেও ওতে শান্তি আসছে দেখতে পাব।

ওরা ভাবে কি, আমার এখনও চল্লিশ পার হয়নি?

॥ নয় ॥

রায় গিন্নী, গিরিবালা আর মায়াকে দিয়ে মেয়ের ঘরে মন মন ধান আর পাঠায় না। মায়া লুকিয়ে ধানের বস্তা মাথায় করে দিয়ে আসুক চায় না। কারণ এখন সে রায় কর্তার জমি ভাগে চাষ করে। যে কোন মানুষেরই সন্দেহ হতে পারে। রায় গিন্নী এখন মেয়ের ঘর কিভাবে কি পাঠায়, তাতে মায়া কোন নজর দেয় না। কিন্তু দুধালো গাইটির এক থলে ঘাস এনে দিয়ে ক্ষান্ত হয়।

খগেন রায় মায়ার উপর এমই বিশ্বাস যে, কত ধান ফলল দেখে না। জমির সার সম্বন্ধেও না। শুধু বলে দিত, ওরে মায়া জমিতে ঠিক মত লোগিত করিস। কিন্তু মায়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

গিরিবালা প্রথম প্রথম বলত—দেখ মায়া, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলে ওকে বলে কি হবে—সমস্ত লোগিত এখন তুমি কর এ ফসল থেকে কেটে নেবে। তারপর বলত, কিন্তু ওতে লাভ কি আমাদের। এতগুলো টাকা, শুধু শুধু জোড়া হয়ে থাকে। কত কে টাকার বাচ্চা বিয়োতে দেয়। কিন্তু আমরাও পারিনি।

রায় কর্তার তখনই গা জ্বলে যায়। কোন কথা না বলে চলে যায় গিন্নীও বুঝতে পারে কর্তা বিগড়েছে।

পাঁচু ঘোষ জমি ভাগে চাষ করত। ধান ঝাড়া, সারানোর পর গিন্নী নিজেদের ভাগ থেকে, বস্তা বস্তা ধান মেয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিত। ওতে পাঁচুরও উপরি কিছু থাকত।

রায় কর্তার কানে আসায়, তাকে আর ভাগে জমি দেয়নি। পাঁচু আপত্তি করেছিল। কিন্তু তখনকার গ্রাম্য মোড়লী বিচারে তার শাস্তি হয়েছিল যে, সে মনিবের ধান তাকে না জানিয়ে মাথায় তুলে নিয়ে যাওয়া অর্থই চুরি করা। এবার কোথায় নিয়ে যাবে, কাকে দেবে সে প্রশ্নের উত্তর কেউ চায় নি। কিংবা কেউ অমন প্রশ্ন তোলেনি।

'তারপর থেকেই খগেন কাউকে আর জমি ভাগে দেবে, এ কথা ভাবে নি।

কিন্তু মায়ার মায়াময়ী মুখের দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় জমি ভাগে দিল।

সেই মুরুব্বি বিচার আজ আর নাই। এখন বাঘে ছুঁলে আটরো ঘা, অর্থাৎ জমি তোমার, কিন্তু ফসল ফলাবার ক্ষমতা আমার।

গিরিবালার প্রায়ই পাঁচুঘোষের উপর সহানুভূতি জাগত। কিন্তু এখন এক ছেলে গ্রামের পিওন ও ছোটটি স্কুলে অ-আ-ক-খ পড়ানো মাষ্টার। এতে কেউ কারও আর চিন্তায় থাকে না। রায় কর্তা কাজটা ঝোঁকের বশে করে ফেললেও, ছেলে দুটোর জন্য এক এক সময় চিন্তায় পড়ে। কারণ চাকরীর যা বাজার, তার ছেলেরা কোনদিনই পাবে না। রায় কর্তা প্রাচীন লোক। কিছুদিন প্রাইমারী শিক্ষকতাও করেছে। তারপর নিজের জমি-জায়গা দেখতে গিয়েই চাকরী বিসর্জন দিয়ে বাড়ীতে শিব সেজে বসেছিল। তার মত একটাই, কান টানলে মাথা আসে, শিক্ষার বর্তমান ধারাটা অবিকল তাই।

পরিবেশ মত বুদ্ধি, জাতিগত শিক্ষা, পেশাগত চাকরী। তার মতে মানুষের মধ্যে জাতবিচার উঠতে বসেছে। কিন্তু মানুষ আজ শিক্ষাটাকে জাতিগত বিচারের পর্য্যায় এনে ফেলেছে।

অর্থাৎ মানুষ আজ এক। কিন্তু মা সরস্বতী. যুগের ধারায় হাড়ি, মুচি, বামুন, বোষ্টম হয়ে বিরাজ করছে।

খগেন রায় যা বলছে—সত্যই কি মা সরস্বতী জাতিগতভাবে উদয় হয়েছে?—না সে ওভাবে উদয় হয়েছিলো?—অর্থাৎ চিরদিনই উনি

ওভাবে উদয় ছিলো—কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। না এখনই সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছে ?

মা সরস্বতীর বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ নিয়ে এত জল ঘোলা করার কারণ কি ?—সত্যিই কি এতদিন মাকে ডাকার সুযোগ সবার ছিল না ? তাই আজ সবাই মায়ের পুজোয় ব্রতী হয়েছে। কেন—রাজনীতির চাপে ? না মা নিজেই রাজনীতি করতে শুরু করেছে।

কিন্তু মা যদি নিজে রাজনীতি করতো, তবে তার অঙ্গে উঁচুনীচুর ইঙ্গিত থাকত। অর্থাৎ মাকে নিয়ে আমার তোমার রাজনীতি। ব্যস ! আসল কথাটুকু এবার নিজের মুখে স্বীকার কর। অস্তিত্ব রক্ষা নয় স্বার্থরক্ষা করবো বলেই রাজনীতি করছি। তাতে সরস্বতী, মা না দেবী সে দেখার আমার দরকার নেই ! আমাকে লেখা পড়া শিখে পাঁচজনের একজন বলে পরিচয় দিতে হবে। তারপর ভদ্র হয়েছি বলে ইদানীং সমাজের ঢাকনাটা বর্তমান সমাজের রুচি অনুযায়ী করাতে হবে। তারপর তো খাওয়া। এর মধ্যে আবার আসল ভাবটি লুকিয়ে আছে বাঁচার মত বাঁচা। পেটপুরে খেতে হবে, তবে পিঠে ঠেলতে পারবে। আবার পেট ভরে না খেলে, হাড় থাকলেও মাংস গজাবে কি করে ? ওতেও মনঃপুত নও—তাই রীতি অনুসারে মাংস খেতে হবে, মাংস বৃদ্ধির জন্য। ঘি খাওয়া চাই বল হবার জন্য। আর দুধ চাই বীর্যবান হবার জন্য। হে মহামানব ! তোমার যদি এত দরকার, তবে সুপুরুষ হবার জন্য আর যা খাবার দরকার, তুমি খাবে না কেন ? সুতরাং তুমিই যদি রান্নাঘর লুট করলে, বাকীরাতো চাটার দল। সুতরাং তোমার রাজনীতির গুণে মাও রাজনীতি শিখেছে বলে মানতে হবে।

বাহবা !—মুচি ঢাক বাজাত, ব্রাহ্মণ মায়ের পুজো করত, আর আমরা পুজো দিতাম। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতো না। আমরা তিনজনই মা-মা বলে ভক্তি ভরে প্রণাম করে, কে বাদ্য-বাজনা বাজলো, কে পুজো করল, আর কে-ইবা পুজো দিল তার বিচার করতাম না। সকলেই তাঁর ভক্ত বলে ভক্তি ভরে প্রণাম করতুম। কিন্তু বাঁচার জন্য নানারূপে তাঁর কাছে ভক্তরূপে দেখা দিতুম।

আজকের শিক্ষাও তো সেই মুচি, ব্রাহ্মণ আর দাতা করে রেখেছে। সে শুধু আ-অ, ক-খ শিখতে এসেছে। সে ঢাক বাজাতে এসেছে। যে অ-আ, ক-খ এর সঙ্গে A-B C-D বলতে শিখেছে, সে ব্রাহ্মণ বলে খেতাব অর্জন করছে। আর এই দু-এর মাঝে পড়ে যারা শুধু জল ঘোলা করছে,

তারাই আমরা, সবাই দাতা।

কি অবিচার!—বলিয়ে দেখ না গুরুমশাই, সবাই যদি অ-আ এর সঙ্গে A-B-C-D বললে ব্রাহ্মণ হয়।. কিন্তু গুরুমশাইও দক্ষিণার তারতম্যের দরুন সবাইকে বলাবেন না। আবার তাঁরই যদি ঠিক মত শিক্ষা না থাকে, তবে ছাত্রের কাছে ধরা পড়ে নিজের পেশাটা খোরাক আর কি! সুতরাং ব্রাহ্মণের বাস স্বর্গ সুলভ নগরে, দাতাদের বাস, ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং মুচির বাস অজ পাড়াগাঁয়ে।

মাগো তোকে অসংখ্য নমস্কার। আর তোর ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিমান বেটাদের আরও বেশী নমস্কার! কারণ তাদের গুণেই তুই আজ নমস্কার নিচ্ছিস। তাদের গুনেই, তাদের ছেলেরা তোকে পুজেছে। আর আমরা অবল-অবলা, সরল-সরলা নারী, পুরুষ হয়ে শুধু প্রণাম করে যাচ্ছি। পেট?—দূর দূর! পুজো করলে উপবাস করতে হয় যে! কিন্তু যারা শিক্ষিত, তারা বুঝছে, কতদিন আর উপবাস করে থাকা যায়? সবই ব্রাহ্মণের ভণ্ডামী। তখনই ব্রাহ্মণরা চাল কলা ছুঁড়ে দিচ্ছে, চারটে চাল, চারটুকরো কলা, পেটে হাত বুলানোর ব্রতী অগুনতি। এবার ব্রাহ্মণের হাতে ধরা পায়ে ধরা ছোঁড়ো হে ব্রাহ্মণ—এ যেন সন্ন্যাসীদের ফল ছোঁড়া। ব্যস! ব্রাহ্মণদের দাম বাড়ল। বুভুক্ষুদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে নিশ্চিন্তে তিলকটা আরও ভাল করে কেটে হাত দুলিয়ে পায়ে খড়ম লাগিয়ে টিকি নাড়াতে নাড়াতে ফিরলো বাড়ী। প্রসাদ নিয়ে চলেছে। চাল কলা পাবার আশায় কতজন, কতজন?

খগেন বলছে, দেবতারাও রাজনীতি করতো। তবে তারা এত বুদ্ধি ধরতে পারতো না। কিন্তু শিক্ষিত, রাজদণ্ডধারী ব্রাহ্মণরা আরও বেশী চালাক। সুতরাং রায় কর্তার ছেলেরা চাকরী পাবে কোথায়? তাদের হৈ, হৈ—হল্লা করতে লাগিয়ে, ব্রাহ্মণরা ছেলেদের তিলক কাটিয়ে নমঃবিষ্ণু বলাচ্ছে। তাই আজ রায় কর্তার চোখে ঘুম নাই। শুধু ভাবছে এবং মাঝে মাঝে কপালে হাত চাপড়াচ্ছে। একি অবিচার। নীতি বাবুও রাজা সেজে, শেষে মা সরস্বতীর কোলটাও দখল করে নিলো। হায় হরি, হরিহে! আমরা এখন যাই কোথায়?

পিছন থেকে ডাক এলো—হ্যাঁগো, শুনেছো—মাগ্না বুঝি আজকাল পোয়াল কুঁটিগুলো, সাড়ে সাড়ে নিয়ে পালাচ্ছে? তা হোক। না, কি হ্যাঁ—কিছু জিজ্ঞাসা করা নাই? বলেই গিরিবালা উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

খগেন বলল—তোমার মনিব গরু পায়ে পায়ে মাড়াবে, আর ওগুলো ওর চাকর গরু স্বচ্ছন্দে খাবে ! সেইত দেবে, গো-ময় মাখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাক না।

গিরিবালা বলল—আমি কি জানি ? বড় ছেলে ঘরে এসে আছে । সে-ই দেখে এসে বলল, বলেই তোমাকে কথাটা শুনিয়ে গেলুম। ঠিকইত, সংসার বাড়ছে বাড়বে, আমাদের কি করে চলবে, আমি না ভাবলেও ছেলেরাতো অবুঝ নয়। তুমি কি বল ?

খগেন বলল—তোমার বুজদার ছেলেকে বল মায়াও একপাটি ঘাস এনে দিয়ে যায়।

গিরিবালা বলল ওটা তাকে দিয়ে যেতেই হবে। সেও জানে দরদ না দেখালে তাকে আমরা দরদ দেখাব না। দেখো, ওকে অনেক মাথায় তুলছে অমন লাল মাখিয়ে, দরদ দিয়ে যদি বলবে, তবে আমি থাকাকালিন নয়। যা বলবে ছেলের সামনে বলবে।

খগেন বলল, ওঃ ভাগে জমি দিয়েছে বলে ভাবছ সে এটা বেগার দেয় ? শোন রক্ত লাল, কিন্তু খবরদার কারও সামনে বলনি, তার মধ্যেও ঐ লাল রক্ত আছে। তখন সে তোমরাই দেহের রক্ত দেখতে চাইবে। কারণ কেউ নিজের চেয়ে অপরকে তত বেশী ভাল বাসেনি—ঝোঁকের বসেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।

গিরিবালা বলল—তোমার ছেলেও মরিয়া হয়ে জেনে নিয়েছে। বাবার ভিটেয় বসব, বাবার হালে খাব, হৈ, হৈ-হল্লা করে একটা কিছু আদায় করে গুছিয়ে নেব।

খগেন বলল—শোন, ছেলেকে এখন থেকে বলে দাও, তারও যেমন হৈ-হল্লা করার লোকের অভাব নাই। যার পিছনে ফেউ ফেউ করবে তারও আছে বড় দল। হাঁক পাড়লে ডাক ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

গিরিবালা বলল দেখ, আমার ছেলে হাত তোলার দলেও নয়, আর লেজ গুটিয়ে নেবার দলেও নয়।

সঙ্গে সঙ্গে খগেন বলল—হুঁ, ইয়ার বন্ধুদের পাল্লায় না পড়ে লেখা-পড়া করে যদি কত মানুষ হোত ! দেখ, কে কেমন মানুষ হয়েছে, সে আমি তাকালেই, একটা মানুষকে বুঝতে পারি। শুধু বলে দিই—আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। বরং ছেলেকে বলো। বই যেমন পড়েছে, এখন তাকে মানুষও পড়তে বলো।

পিছনে একটা ধুপ করে কি যেন শব্দ হোল—ও চেঁচিয়ে উঠল

জ্যাঠাইমা, যেমন পোয়ালের বোঝা নিয়ে গিয়েছিলুম, ঠিক সেইটিই রেখে যাচ্ছি। কেন বাবু আগেই বলতে পারতে। তোমার এখন ছেলে কর্তা তার অনুমতি চাই। তাহোক দুপুরেই পিঠে, পিঠে লোক পাঠিয়েছে। কেন এ-কি হাড়ু-ডু খেলা নাকি? পিঠে পিঠে ডাক না চালালে, খেলা জমবে না। হার জিত হবে না। আচ্ছা—আমিও পিঠে পিঠে ডাক দিতে জানি—কি জানি না একবার দেখব।

॥ দশ ॥

মেজবোন, জয়ার এই কিছুদিন হোল মায়া বিয়ে দিয়েছে। জামাই পলাশ, মায়ার চাষের সময় কোমরে কাপড় কোঁচা গুঁজে খাটে। কিন্তু বিয়ের সময় পণের জ্বালায়, মায়া প্রায় সারা বছরের ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

পলাশ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন। মায়ার কষ্ট দেখে প্রায়ই হেসে হেসে বলে, দিদি দান করলে কষ্ট নাই। জানবে ভাইকে দিয়েছি।

কিন্তু মায়া বেশ বুঝতে পারে, এ শুধু পলাশের দুকান কাটার মত কথা।

তাই সে চুপ করেই থাকে। এক এক সময় মনে করে। বলবে, বোনকে দান করেছি, আর ভগ্নিপতিকে পণ দিয়েছি। কিন্তু তাকে কথাটা আর বলতে হয়নি।

মাণিক-ই বলে দেয় পণ নেওয়া জামাই বলেই পরিত্রাণ। না হলে শ্বশুর ঘরে ষষ্টীতে একবার আসত, আর একবার আসত দশমীর প্রণাম সারতে।

পলাশ বললে—হ্যাঁ, বড়কর্তা, হ্যাঁ। দিদির কাছে ঋণ করেছি, তাই তার পরিশোধ করছি।

মায়া বলল—না ভাই, ওকথা কেন? তোমরা আজ পাবার যোগ্য তাই পেয়েছ। আগে যে আমরা পেতাম।

পলাশ বলল—তোমরা নও—বল, তোমাদের আগের মেয়েরা। আগে বরকর্তা গালে হাত দিয়ে বলত, মেয়ের মা-বাবা দামড়া গরুর দর তুলছে। আর এখন আলু পটলের দাম। সেই জন্যই আলু পটল আর বাজারে বিক্রি হচ্ছেনি। রাস্তায় নামলেই যে পারছে বক খাঁপচানো করে তুলে

নিচ্ছে। তারপর মাণিকের দিকে তাকিয়ে বলল, এইত বড় বাবু মুচকি মুচকি হাসছে।

মাণিক আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

মায়া কথাটা কানে নিল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। অন্য দিকে না তাকিয়ে, আপন মনে ভাবতে লাগল। ভাবনা তার অনেক, তবে সব-চেয়ে বড় ভাবনা—বোনেদের কিভাবে বিদেয় করবে।

কার সংসার, কে দেখছে। মনে আসে বাবার কথা! বাবা এখনও একই সংসারে আছে। খুশীমত কাজ করে, নয়ত বিনা খাটুনিতে হেসে খেলে দিন কাটিয়ে দেয়। মায়া চেনে—বাবা। বোনেরা জানে, বাবা তাদের সংসারে একটা ফাউ। আত্মীয়রা জানে বাবা আছে বলেই সংসারটা এখনও টিকে আছে। · কিন্তু ওতে মায়ার কিছু যায় আসে না। চাষ করে খেটে আনে, সবার সঙ্গে তারও পেট চলে যায়। তবে দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। মায়া ভাবে, মায়া নাই। .সত্যিই-তো সবাই বলে, 'মায়ার সংসার'। কিন্তু মায়া নামটা মানুষ এখনও মানুষের নামই শুনেছে। কিন্তু অন্তরাত্মার যে টান, সেটাই মানুষ আজ আর মনে করে দেখে না। আত্মার আত্মীয় হলে, সে আত্মীয়। কিন্তু আত্মা কি? তাই আত্মীয়রা বোঝে না। মুখে মুখে সবার একই কথা—খাও, দাও কাটিয়ে দাও। দেখে দেখে মানুষ আর একই জিনিষ দেখতে চায় না। তাই নতুনের খোঁজ। সব কিছুই ভাসা, ভাসা, গভীরতা নেই। নিকট আত্মীয় আজ খোঁজে নতুন আত্মীয়।

মানুষ আজ নিঃসংকোচে বলে, আপনের চেয়ে পর ভাল, তার চেয়ে জঙ্গল ভাল। এই জঙ্গলাকীর্ণ মনে, কারও যে স্হিতি নাই, পরিবেশ নাই। তবু তাকেই মানুষ চায়। অর্থাৎ তোমার না হলেও সবার মন যে জঙ্গলাকীর্ণ!

কিন্তু যারা সত্যই শান্তির প্রত্যাশী, তারা নীরব। নির্জনপ্রিয়, একাকী।

এখানে এরা সংসার বিরাগী না হলেও, মানুষ বিরাগী।

কিন্তু তারা কেমন মানুষ? যারা তার শান্তির পরিপন্হী!

অশান্ত জগতেই শান্তি নিজের কাছে। হুঁ, শব্দে মায়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। পিছন থেকে শব্দ এলো—মায়া, গাইটার ঘাস আর টনটনে একথলে পেঁছায় নি। উপরন্তু গোটা গোয়াল গু-এর ছোড়া যে—·গাই দুইবে এমন ক্ষমতা তোর জ্যাঠাইমার নাই। কেন তুই তোর ভাই

দুটোকে আমার গোয়ালে পাঠাস ! কাজের গুণে মানুষ ছোট, এ-যে তাই ওরা দেখিয়ে আসছে। থু-থু, সবাই বলছে ঝোড়া ঝোড়া গু ! বলেই খগেন রায় লাঠি ছেড়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

মায়া অবাক হয়ে কালুর দিকে তাকাল। তারপর বলল—জ্যাঠামশাই আমার ছোট ভাই এখন নিজেই গু করব বলে, জমিতে চলে যায় ! তাছাড়া ও-ত তোমার গোয়াল কোন দিন মাড়ায়নি।

খগেন বলল—না, না। যেদুটো ঘাস দিয়ে আসে, তারাই এখনও গু করব বলতে জানে নি। দেখ না, আমারই কেমন গা ঘিন ঘিন করছে। যদিও আমি এখনও গোয়াল মাড়াই নি। বলেই খগেন সত্যই থু, থু করে থুতু ফেলল।

মায়া বলল—দেখ জ্যাঠামশাই, কথায় কথায় তুমি আমার ভাই দুটোকে কেন—আমাদের গুষ্টীর ষষ্ঠী পূজা করে দিলে। কিন্তু তবুও বলছি, অপরের মুখে ঝাল না খেয়ে, নিজে গিয়ে দেখ।

এটা জ্যাঠাইমার চিরকালের অভ্যাস।—আমাদের ছোঁয়া মা-লক্ষ্মী ধান তাকেই, হাত দিতে ঘেন্না করে—আমরা কিনা ছোট জাত।

খগেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চালার পাশ দিয়ে কে একটি ছেলে এসে জুটল। সঙ্গে সঙ্গে মাণিক ও চাঁদু গিয়ে হাজির হোল। চাঁদু হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁরে পেঁচো, জুম লেগেছে ! শালা বুড়ো ছুটে এসেছে। আর বুড়ি ঘন ঘন কাপড় কাচছে আর থুতু থুতু ফেলে ফেলে মুখটা চটকরে তুলেছে। শয়তানী খোচ্‌রি মাগী আমার দিদিকে ছোট করবে। যেমন তোর ছুঁচিবাই তেমনি—

নাইয়ে, নাইয়ে এবার নিমোনিয়া করিয়ে ছাড়ব।

পেঁচো বলল—ওরে শালারা, তারা বড় লোক। ডাক্তারী খরচকে কি ভয় করে ? কিন্তু আমি যে এই শীতে গাই-এর গা ধুইয়ে ধুইয়ে হোঁস ফোঁস করে হাঁচাছি, আর কাশিতে যে সারা রাত চোখ বুজেনি। এই দ্যাখ, গাই-এর গা ধুইয়ে তোদের বলতে এলুম পরশুর খোল ফেলে দিয়েছি। ছ্যা, ছ্যা—শুঁকে দ্যাখ। কেমন গু পচা গন্ধ উঠছে। বলে হাত দুটো চাঁদুর নাকে কাছে তুলে ধরল। তারপর বলল—না, গিন্নীকে আচ্ছা জব্দ করলি বটে।

চাঁদু বলল, দেখ পেঁচো, আমাদের কথা যদি না। শুনবি, গরুর দড়ি খুলে নিয়ে মাঠময় ছুটাব। আর দড়ির দায়ে কেন চাকরীটা খোয়াবি।

তারপর বলল—বলে দিলে গণ ধোলাই হবে, আরে বাগাল ধোলাই গেছে কোথায় ?

পেঁচো বলল—আর ক'দিন ?

চাঁদু ও মাণিক বলল—গিন্নীর নিমোনিয়া হয়ে বিছানায় হেগে মুতে পড়ে থাকুক, ডাক্তার উঠুক, তবে তো।

যাক, চলি বলে পেঁচো চলে গেল।

খগেন আবার বলল—আচ্ছা মা-মায়া তুই বাবু একবার চলত, আমি ওদের কথা, বিশ্বাস করিনি। না, না, দুর্নাম বলে দুর্নাম। চলতো মা, চল একবার।

মায়া রায় বুড়োর পিছু পিছু গোয়ালের কাছে হাজির হল।

পেঁচো—তখন গাইটাকে রোদে বেঁধে ঝোড়া শুদ্ধ ঘাস ক-টা ধরে দিয়েছে। লাবণী মনের আনন্দে মৌজ করে ঘাসগুলো খাচ্ছে।

মায়া গোয়ালে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিবালা বলল—ওরে ও পেঁচো, ঘাসগুলো এখন আবার কেন দিলি ?

বলেই ঘাসের ঝোড়াটা সরিয়ে রেখে মায়াকে বলল—দেখ বাবু, এই ঘাস আনাটাই হয়েছে আপদ! কেন বাবু, ঘাস এনে দিবিনি ঠিক আছে, আমি কারও ছেলের মাথায় করাত চাপাব না! ছ্যা, ছ্যা, এমন খল, নোংরা বদমাইশ ছেলে জানলে—সত্যিই মায়া মুখে আনতুমনি। —যে আমার গাইকে এক মুঠো ঘাস এনে দে। দেখ মা, দ্যাখ ঐ তো ঘাসের চেহারা!

মায়া বলল—জ্যাঠাইমা, বলছে বলুক, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, ঐ ঘাসগুলোতে আমার ভাইয়েরা হেগে রাখে, তবে তুমি সরালে কেন ? আরও একবার গা ধুয়ে দেখাব, আমরা ছোট জাত।

গিরিবালা বলল—ও বাবা! উচিত কথা বলাও খারাপ। বলেনি, বিষ নাই, কুলো পানা চক্র।

মায়া বলল জ্যাঠাইমা, আমি দেখতে এসেছি, কই আমার হাতের তেলোর ভাইয়েরা হেগে, তোমার গোয়াল নেংরা নরক করে গেছে।

গিরিবালা বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু চল। দেখলে তোর বিশ্বাস হবে বলেই দুজনে গোয়ালের পাশে গিয়ে হাজির হল ?

গিরিবালা ডানহাতে নাক টিপে নেংচিয়ে যেতে যেতে ব্যাঙের মত লাফ দেয়, আর আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, দেখ, কেমন গু-এর ছোড়া, যত সব উদ্ভট কারবার! এঁ্যা, আজ কত বছর কাঁচ ছেলের গু ঘাঁটিনি।

বলত বাবু, আমার ছোট ছেলে অনু কলেজে পড়ছে তো।

মায়া দেখল, খোল পচে গন্ধ বের হচ্ছে। গু ভেবে রায় গিন্নী মিথ্যে হৈ, হৈ শুরু করেছে। মায়া হাত দিয়ে খোল পচা তুলে নিয়ে বলল—কে বলল জ্যাঠাইমা এটা মানুষের গু। এ-তো ভিজে খোল। ক-দিন জলে থেকে পচে গেছে। বলে মায়ার নাকের কাছে পচা খোল তুলে শুঁকতে লাগলো।

গিরিবালা—মুখ বাঁকিয়ে চোখ বুজে বমি করে আর কি। ছিঃ ছিঃ তাইত বলে, যাই খারাপ হোক, আপনার পুত। আরে ভাই হলেও নিজর পেটেরটির মত করে মানুষ করতে হয়েছে তো।

মায়া বলল—দেখ, জ্যাঠাইমা আমরা কাক নই যে না দেখে কা-কা করে সারা রাজ্যের কাক জড়ো করব। খোলকে খোল বলি, গু হলে গু বলতুম। তারপর বলল, যারা ছুঁই ছুঁই করে তাদের ভাগ্যে এমনই অঘটন ঘটে থাকে।

রায় গিন্নী বলল—বটে তুই আমার ভাগ্য কাড়ালি। বলি খোলের ছড়াটা দিল কে?

মায়া বলল—কুকুর আসেনি তো? খেতে গিয়ে মুখে করে ছড়া দিয়ে গেছে।

গিরিবালা মায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—ঠিকই বলেছিস। কুকুর-ই আমার পিছু লাগবে।

কুকুর আসবে কেন? কেন রায় গিন্নীর কি ভাতের অভাব, যে কুকুর গোয়ালে খোল চুরি করতে আসবে?

॥ এগারো ॥

মায়া জমি পাওয়ান দিচ্ছিল। কাবেরী ছুটতে ছুটতে এসে হাঁকতে হাঁকতে বললে, মায়াদি তুই এখানে জমি পাওয়ান দিচ্ছিস, আর মাণিক যে ওদিকে গলায় দড়ি দেবে বলে দড়ি নিয়ে গাছে উঠেছিল। সকলের ধরা-বাধায় নেমেছে, দেখবি চল—মালির ভিটের গঙ্গা যাত্রী জুটে তাকে ঘিরে রেখেছে।

সে-কি রে? বলেই মায়া জমি পাওয়ান দেওয়া বন্ধ করে, অপরের জমিতে জল ছেড়ে দিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে ঘরের দিকে ছুটল। এসে

দেখল শিবু জ্যাঠা—জিজ্ঞাসা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিয়ে কখনও ধমকাচ্ছে কখনও চড় তুলছে।

শালা ভূত ধরেছে? মেয়েটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করেছিস স্কুল যাচ্ছিস, মানুষ হোবি বলে, তা না করে, মরণ ফাঁদ! মার শালাকে মার। বলে আবার চড় তুলল।

মালতী, স্বামীর হাত ধরে বলল—কার ছেলে, কাকে শাসাচ্ছ? মায়া আসুক তারপর তার কথা।

শিবু বলল, রাগ কি সাধে ওঠে, ও-কি কাঁচ ছেলে? জিজ্ঞাসা করতে করতে মুখ মুড়ো হয়ে গেল। তবু কি বলছে, কি হল? কিসের অভিমান?

না দিদি বকা ঝকা করেছে,—যে ওকে গলায় দড়ি দিতে হবে—কই মায়া এলো?

মায়া তখন সামনে দাঁড়িয়ে।

সকলে চেঁচিয়ে রসিকতা করে বলে উঠল—শিবু জ্যাঠা মায়াদি তোমার সামনে—সম্মুখ সমরে।

শিবু চেঁচিয়ে উঠল—শালারা দিন কালের পণ্ডিত তো! যেমন এক পণ্ডিত গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল। শোন ছোঁড়ারা, তোদের গলায় দড়ি জুটবেনি।

তাদের মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বলল—পোকা মারা ওষধ এখন ঘরে ঘরে—খেলেই হরি বোল?

শিবু বলল হ্যাঁ। ফসলের পোকা মারে, আর তোদের মত সংসারে পোকাগুলো ওভাবে মরবি বলেই, ভগবান আজকাল একের পর এক বিষ এগিয়ে দিচ্ছে। তারপর মায়াকে বলল কি গো, জেল খাটতে যাবি নাকি? ভাই এর মুখে যে বোল ফুটছেনি।

মায়া বলল—কি হয়েছে ও-ই জানে।

শিবু দড়িটা মায়ার হাতে দিয়ে বলল—দড়িটা পুড়িয়ে দিস মা। কেন আবার অবধূতকে ডাকবে।

মায়া কিছু না বলে, মাণিককে বলল—চল ঘরে উঠে চল।

মাণিক ছোট ছেলের মত মায়ার পিছু পিছু ঘরে চলে এল।

ক'দিন ধরেই খগেন রায়ের বাড়ীতে কানাঘোষা হচ্ছিল, মানুষ তবে বনেদী বলত কেন রে?

খগেনের বড় ছেলে শীতল বলল—হ্যাঁ, তবে ত সবাই রাতারাতি ক এর নীচে খ লিখে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলত মানুষ হয়েছি। আমার উঁচু মাথার দাম কত, তা জান ?

খগেন বলল—বুঝলি শীতল, কথাটা আমি আগেই বলেছি। মা-ষ্টি ছিলি এবার মায়ারাণী হোবি। কারণ ভাই, গণনেতা না হলেও গেঁয়ো নেতা হবে তো। কিন্তু যা শুনেছি, ওতো অসুর বধের পালা আরম্ভ হয়েছে। তারপর একটু থেমে বলল হ্যাঁ, এমন হওয়ার দরকার রয়েছে। কারণ আমাদের মত তবে আসল শিক্ষিতদের দাম কোথায় ? হুঁ, এ আর তোমাদের শিক্ষা নয় বাবা—যে মাষ্টার ছড়ি দেখাবে, তারই ছড়ি পিঠে গিয়ে পড়বে। আমরা ছড়ি খেয়েছি, তাই ছড়ির ভয় সব সময়। কিন্তু তোমরা ছড়ি খাওনি, তাই তোমাদের ভয় ডর নাই। অপমান, অসম্মান সব গলার হার। দূর, দূর,—যেদিন মাণিকচন্দর গলায় লকেট ঝুলিয়েছে দেখেছি—সে-দিনই বুঝেছি মহামায়া মর্তে আবার আবির্ভূতা হয়েছে।

শীতল বলল—না, না। তা নয়—সঙ্গীগুলো কেমন দেখতে হবে তো ?

খগেন বলল—তা নয়, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। স্বামীজীর কথা কি ব্যর্থ হয় বাবা "বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।" কিন্তু এখন যে সবারই হাম বড় ভাব, ভাবে ছোট হওয়া মানে, চেহারায় খাটো হওয়া, মানে তিন তাল গাছ।

শীতল দেখল, বাবার সঙ্গে তার আর যুজে ওঠা সম্ভব নয়। নিজের বিদ্যার কবরখানা এখুনি বের হয়ে পড়বে। তাই সে মানে মানে কেটে পড়ল।

মায়া সামনে দাঁড়িয়ে বলল—জ্যাঠামশাই সামনের পঁচিশ কাঠার, বারো কাঠায় তিল বুনেছি,—বাকীতে পেঁয়াজ, তারপর পাট বুনব ঠিক করেছি।

খগেন বলল—হ্যাঁ, তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর মা। শুধু বলি, ভাগটা যেন মানে মানে পাই—বস্তা ধরাধরি, উফিল কাড়াকাড়ি আমার বরাতে সহেনি বাবু।

মায়া হাসতে হাসতে বলল—আমরা পরের বাপকে বাপ বলিনি কাকাবাবু। তবে বাবু তোমরই বাবা বলতে বাধ্য করাও, বড়দা আওয়াজ তুলেছে, আমি নাকি, ঠিক ঠিক ভাগ দিইনি।

খগেন ছুটে এসে বলল—চুপ! চুপ! আমি রায়কর্তা। আমার

পাঁঠা যেদিকে খুশী কাটতে পারি।

মায়া বলল—বাবা যে ছেলের টান টানেনি, সে জানব কি করে?

যাক দাঁড়ালে হবেনি, তিল কেনা হয়ে গেছে, জমিতে দাঁড়া বেঁধে জল ছাড়া হয়েছে।

খগেন অবাক হয়ে বলল—কেন মা, ভাগের ভাগ তিল পেঁছে দিয়ে তখনইত অনুমতি নিতে পারতে।—সেই জন্যই বলে লাই দিলে পাই পায়।

মায়া বলল—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। তুমি আছ বলে তাই নিয়ে যাচ্ছি—বড়দা হলে ওটা নিয়ে যেতুম নি—ভাগের ভাগ ফেলে দিয়ে যেতুম। তারপর রেগে এগিয়ে এসে বলল—মহাদেব রানার জমি চাষ করি। কই বলুকতো, আমি তার ভাগিদার, না সে আমার জমিদার।

যা বোঝাতে হয়, বড়দাকে বোঝাবেন আমি ঠিক আছি।' মায়া আর না দাঁড়িয়ে চলে আসতে গেলে।

খগেন বলল—ঘরের খোঁজ রাখিস?

মায়া বলল—জানতুম নি। এখানেই এসে শুনলুম, ভাই ও যে সব……।

খগেন বলল— না, না। ওকথা বলতে যাব কেন? তবে কি জানিস। আমারই জমি চাষ করিস তো, ভাগচাষী বলে কথা—তোর সঙ্গে আমার তো মানে মানে মান সম্মাক ইজ্জতের প্রশ্ন।……

মায়া বলল—না, না। মানুষ এখন যে তার ইজ্জত নিয়েই ব্যস্ত। আমার ভাই এর বয়স হয়েছে—স্কুল গিয়ে নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে, তাকে আমি বললেই কি, আর তুমি বললেই কি শুনবে?

খগেন বলল—তাইতো বলেনি "অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

মায়া বলল—আমি জানি কর্তব্য করেছি—সে জানে কর্তব্য করছে। যাক আপন হতে জগন্নাথ, কথা শেষ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল?

॥ বারো ॥

মাত্র মাস খানেকের মধ্যে মাণিক আবার গলায় দড়ি দিতে গেল। এবার আর বাইরে নয়। দিদির অসাক্ষাতে নিজেদের ঘরেই। আগে তবুও ঘরে ছোট ভাই ও বোন দুটো ছোটাদৌড়া করত। কিন্তু তারা স্কুল যায়, বাকী সময়টুকু দিদির সঙ্গে চাষে খাটে। বাবা জগু মালিকও দ্বিতীয় সংসার করে ঘর ছেড়ে শ্বশুর ঘরে গিয়ে উঠেছে।

ইতিহাসের ইতিকথা বলে, ধরা ছোঁয়া করে শেষ করলে, ফলন থামে না। প্রাণ চায় না, মনে ধরে না,—জগুর নেশা নিত্য নৈমিত্তিক বাড়তেই ছিল। কিন্তু টাকা পায় কোথায়? ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। তার হাতে গরু ছাগল ছেড়ে দিত না। ঘরের জিনিষ কিছু বিক্রি করে যদিও নেশা করত, ইদানিং সকলের কড়া পাহারায় জগুর পক্ষে ওটাও আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই নেশার খেয়ালে রাস্তায়, তারপর ধারে, তারপর যখন ধারও জুটল না। সে তখন কিভাবে বিনা পয়সায় মদ খাওয়া যায়, তারই জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠল। মাত্র একখানা গাঁ পরেই ফতেপুর, সেখানে মদের ভাঁটি খুলে বসেছিল স্বামী পরিত্যক্তা কমলীমাল। জগু গিয়ে সেখানেই উঠল। কদিন যাতায়াত, তারপরই চোখের ইশারায় জগু বুঝতে পেরেছিল। এখানেই তার পেট, নেশা ও বাকি ইন্দ্রিয়র সুখটুকু সবই ভোগ করে দিব্বি চলে যাবে,—বারোয়ারী আর কেউ বলবে নি। তাই সে নিজেকে কমলীর কাছে বিক্রি করে বসে রইল। জগু বেঁটে, কদম ফুলের মত কোঁকড়া কালোচুল। তার টিকলো নাকের কাছে কত নায়ক হার মানে! তারপরও তার মুখশ্রী। চোখের কোলে পদ্মের মৃণাল যেন হাসে, গোঁফের আড়ালে হাসি যেন শরতের চাঁদিনী রাতের জোয়ার ভাঁটা খেলে কাল বটে, কিন্তু চিক-চিকে ভাব তাকে মায়া হরিণীর কাছে এনে দিত। তখন হরিণী মায়াবীণি মূর্তি, ত্যাগ করে আপন করত।

কে বলে জগু বয়স্ক—কমলী জীবনে যা পায়নি। তাই এখন পেতে চাইল। সে এতদিন নাস্তিক হয়ে কাটাচ্ছিল, কিন্তু সামনে শিকার দেখে ভগবানে বিশ্বাস করে জগুর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করে পুজোর জন্য প্রস্তুত হোল, জগু ভুলে গেল কমলীর ছিনে পা, ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা, পাক খেয়ে ঘোলমুবনী হাঁটা, বাঁকা হাতের খসখসে

সোহাগের পরশ। মুখময় ঢিপি হয়ে থাকা আব জগুর শেষ জীবনের জয়, জয়কারের লক্ষণ।

জগু ভাবল কমলী। মাল নয়, তার জীবনে--মা কলমা-এবং কমলী ভাবল, তার এই ঠুঁটো জগন্নাথ দশা কেটে—জগন্নাথ দশা।

মাণিক বাবার খোঁজটা মায়ার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মায়া ভাইকে ওপথে যেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু মাণিক না গেলও, বন্ধু কজন ইয়ার্কির ছলে গিয়ে পেঁছাত, যেখানে তারা কাজ করত—মদের ভাঁটির পাশে। শেষে মাণিক জন কয়েক বন্ধুকে ত্যাগ করল।

মাণিকের মনে কি যে পরিবর্তন হয়েছিল, সে ছাড়া আর কারও সাধ্য ছিল না বোঝার। বই এর নামে গাদায় নমঃ এবং সঙ্গীনী নামে রাধাকৃষ্ণায় নমঃ। তাই সকলের ডাকাডাকিতে মায়া যখন এসে দেখল, আজ মাণিক নিজের ঘরেই ফাঁস লাগাতে গিয়েছিল,—শুধু ফাঁসটুকু আঁটার অপেক্ষা তখনই তার সেদিনকার খগেন রায়ের তাচ্ছিল্যসহকারে কথাটা মনে পড়ে গেল। সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে মাণিকের দুই হরিহর আত্মা পচা, লখাকে ডেকে পাঠাল।

দু জনই মাসখানেক আগে বিয়ে করে সংসারী হয়ে কাজে মন দিয়েছে। মা বাবার অবাধ্য আর নয়। মায়া বলল হ্যাঁরে পচা লখাই, আমাদের বড় বাবুর খবর তোরা রাখিস ? মরবে কেন ? তোরা থাকতে এমন কি দুঃখ, যে গলায় ফাঁস লাগাতে হবে! সত্যি বলতে কি তোরা যা বলিবি, তাই শুনব।

পচা, হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু লখাই তাকে চোখ টিপে হাসতে নিষেধ করল। তার সঙ্গে খবরটা যেন এখনই ফাঁস না করে দেয়, তার জন্যও ঠোঁটে হাত দিয়ে নিষেধ করে দিল।

কিন্তু মায়ার চারদিকে চোখ—চৌখোস মেয়ে সে।

সে লখাই-এর কানে ধরে সোহাগের ছলে নরম করে গালে চড়টা বসিয়ে বলল—পাজী কোথাকার, দিদির কাছে লুকোচুরি খেলা,—বল। বলছি, নইলে এই চললুম থাঁদির কাছে। নতুন যেমন বিয়ে করেছিস ···ঝাঁটা না তুললেও, চড় বাদ যাবেনি। সে বলবেই।—দুটিতো তোরা তোরা উদ্ধার করেছিস ভাই, তিন নম্বরটি কে ?

লখাই গম্ভীর। কিন্তু পচা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—শুনবে ?—সত্যি বলছ ? ঠিক বলছ—মাণিককে মারবেনি, বল।

লখাই বলল—বাঘ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কি কেউ

বিশ্বাস করে, মানুষ পেলে ঘাড় মটকে খাবেনি। দূর—দূর।

মায়া বলল—এই গোঠচালাক, খাঁদির যদি বিয়ে না হোত, তোর অবস্হাটা কি হোত বলত ?

পচা বলল—ঠিক, ঠিক—নমি আমার ঘর দুবেলা আসে।

লখাই চেঁচিয়ে উঠল দূর ফচ্‌কে।

মায়া বলল—চেঁচামেচিতে আর কাজ নাই। আজই মাণিকের বিয়ে। তোরা আয় যোগাড় পত্র করবি।

পচা চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাঁ সত্যি বলছি দিদি কদিনে মেয়েটা কঙ্কালসার হয়ে গেল। ভয়ে বলিনি, তোমার হাতে কি কারও রেহাই আছে। তা দিদি এত দয়াতো তোমার নয় ?

লখাই বলল—জানিস পচা, দিদি জামাইবাবুর ঘর করলে বিশ্বাস হোত।

মায়া সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে মুখ নীচু করল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উপর দিকে মুখ করে বলল—বুঝলিরে লখাই, ওটাই মাণিকের কাছে শাপে বর হোল। তারপর বলল, বেশ, আমি তোদের ঘরে বসে থাকব চল, বিয়ের যা ব্যবস্হা করতে হয়, তাই করবি।

পচা বলল—যোগাড় পত্র বলতে আর কি-শাঁখা, সিঁদুর আর বামুনটা।

মায়া বলল—কেনরে, নমির বাবাত এক কাজ করতে পারত। ওটাও কালীমন্দিরে সেরে নিলে, ফুল বেল পাতায় কাজ মিটে যেত। তারপর বলে বেড়াত, যার মাথা ফেটেছে, তার চুনের দরকার। আমি মেয়েজামাই পেয়েছি, যার দরকার, সে ছেলে-বউ ঘরে তুলুক। নীতি মানিয়ে মানিয়ে নিত্য কাকা দেখছি, মেয়ের বিয়েতেও হেঁকে বলে দিল হ্যাঁ, আমাকেই মানতে হবে।—ভাবে কি আমার ঘরেও সে নেতা ?

পচা বলল—ঐ তো, শিং বাঁকাবে বলেই, আজও নমি আইবুড়ি।

মায়া বলল—আচ্ছা !

রাতে বহু ধরা বাঁধায় মায়া বিয়ে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। দেখল, নিত্যগোপাল মালিক, কোঁছা গুঁজে গায়ে নতুন গেঞ্জি চড়িয়ে সাগরেদদের লাগিয়ে দিয়ে, নিজে শুধু ভাবের ও হাতের লোকদের বিনি পয়সায় নমস্কার ঠুকতে ঠুকতেই শেষ। মনে হোল, তার মেয়ের বিয়ে নয়, ছেলের বিয়ে দিতে এসেছে। কোন কথাবার্তা নাই, আপ্যায়নও নাই। মনে হোল মায়ারই যেন বোনঝি-এর বিয়ে। গলায় গামছা তাকেই

দিতে হয়েছে। মায়া বলল দেখে যাই, দেখাব পরে।

বরকনে আসার মাত্র একদিন পর, মায়া সকলের সামনে মাণিককে ডাকল। তারপর বলল, আমার সংসারে থাকলে কি তোর সুখ হবে? দেখছিস তো, খেটে আনলে হাঁড়ি চড়ে। তাও, সব দিন পেট ভরে নি। চোখের মাথায় জয়ার বিয়েতে দু-পয়সা যা পুঁজি ছিল সব ভেঙেছি। ভাবলুম স্কুল আর তোর গিয়ে কাজ নাই—চল আমার সঙ্গে কাজে যাবি। কথাটা আমার পেটে এনেছি মুখে আনিনি। যাক, ঈশ্বর আমাকে ওটা থেকে অব্যাহতি দিল। তুই-ই তোর নিজের পথ দেখে নিলি।

মায়ার মন খারাপ, মুখ ভার। সামনে সবাই দাঁড়িয়ে—পিছন থেকে কালীপাল এসে বলল, কিগো মায়া, দোকান বেরিয়েছি হাঁড়ির বাকী পয়সাটা দিতে হবে যে।

মায়া উঠে গিয়ে হাঁড়ি, সরা, খুন্তি, বঁটি—রান্নার যাবতীয় সব ঝোড়া ভর্তি করে ধরে দিয়ে, কালিকে বাকী আড়াই টাকা মিটিয়ে দিল। তারপর বলল মিটল তো?

কালি মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই দিয়েছ। তুমি কি কম দেবার মেয়ে গা!

মায়া বলল—হ্যাঁ দাদা, এ আর আমার গাই-এর দুধ-এর টাকা নয়, কিনেছি টাকা পোয়া, মাসের শেষে টাকা মেটাবার সময় একগোছা টাকা বলে বললুম বার আনা পোয়া।

কালি বলল—নারে দিদি, না। সেটা আবদার করে চেয়ে নিই।

চাঁদু দাঁড়িয়ে শুনছিল, বলল—সেইজনাই দিদিকে টাকাটা গুণে নিতেও সময় দাওনি। হাতে দিয়েই চটপট কেটে পড়। সত্যি দিনকাল যা পড়েছে, হয় কিছুনাই বলে নাকে কাঁদ, নয়ত সব আছে বলে হুম্বি, তুম্বি কর। না হলে কালিদাকে অনুসরণ কর—ধাড়িবাজ! নইলে পেট চলবেনি, গায়েও চড়াতে পারবে নি।

কালি বলল—এ-কি! পাওনা টাকা চাওয়াও দোষ?

চাঁদু বলল—না, এটা তোমার পাওনা টাকা নয়। দিদি তোমাকে টাকা ছেড়ে দিয়ে উপকার করত বলে, ওটা তার গুণকারের টাকা। কারণ যা তোমার হাঁড়ির দাম, দিদি ঠিকই দাম দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ যখন দেখলে, দায়ে পড়ে আনতে গেছে—তখনই তুমি মাছ ভাজা না ভেবে ছেঁকে খাবার তেলটা তুলে নিচ্ছ। নইলে তোমার মত মানুষের অভাব কি?

এখন তাগাদায় এস। বাঃ, বাঃ, বাঃ তুমি কালিদা, এত দিনকালের ধাড়িবাজ লোক, তেলের বোতল দেখিয়ে টাকা আদায় কর। কালি পাল নির্লজ্জের মত দেঁতো হাসি হাসতে, হাসতে বলল—না, না, ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি। যাই ভাব দিদি, দৈনিক দুধ আনতে এসে আমি সব দেখে গেছি। তোর কাকীমাও। যখন শুনলুম তোর মাণিক ওভাবে বিয়ে করল, তারপর যখন শুনলুম আলাদা করে দিবি বলে হাঁড়ি সরা আনতে এসেছিস—তখন ভাবলুম, দেখে আসি যেমন হাঁড়ি, তেমন সরা হয়েছে কিনা ?—কারণ, আমাদের মত ভগবানও গড়ে কিনা ?

তারপর মাণিকের কাছে সরে গিয়ে বলল—হ্যাঁরে, বিয়ের বয়েসকি বয়ে গিয়েছিল। দিদির কথা একটু চিন্তা করতে নাই ? সামনে কালু বাটী হাতে এসে মায়ার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল-দিদি আমাকে মুনি দেয় নি।

সেজবোন ছায়া চেঁচিয়ে উঠল দিদি, মুড়ির টিনে এক গুঁড়োও নাই, যে ওকে দিয়ে ভুলিয়ে কোলে তুলব। কদিন তোমাকে বলছি, ওকে ভোলানো যায় নি। কিন্তু তাতে তোমার কোন রা-বাক্কি নাই।

মায়া চেঁচিয়ে উঠল—টাকা থাকলে কোঁচড়ে কত মুড়ি।—দে টাকা।

ছায়া উত্তর দিল—বলছি ভাতের ফ্যান গেলেই ভাত জুড়োতে দিচ্ছি, খাবি।

কিন্তু তার আর তর সয়নি। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কেন তোমাকে তো বলেছি—দিদি পাঠশালা আর যাবনি, চল আমিও তোমার সঙ্গে কাজে যাই। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে, আর বলে পড় পড়, লিখে দিলেই ছুটি।—গোদাই কাকু ভাবে কি ?

মায়া বলল—পেট ভরা থাকলে পড়বি তো ?

ছায়া উত্তর দিল—তুমি না খেয়ে আমাদের খেতে বলবে, বল একসঙ্গে বসে খাবে ?

মায়া চুপ করে রইল।

কালি আরও সরে এসে বলল—হ্যাঁরে মাণিক, এটা তোর দিদির অভিনয় নয়। এভাবেইত না খেয়ে, না পরে, তোকে স্কুল পাঠিয়ে ছিল। আর তোর এমন কীর্তি—ছি! ছি!

মায়া কালুকে কোলে নিয়ে বলল—দেখ না ভাই, কালিদার—ভাজন খোলা নাই—তাইত মুড়ি ভাজতে পারিনি। ওনাকে বল, যেন আজই মুড়ি ভাজা খোলা দিয়ে যায়।

কালু বলল—কেন, ঐ তো ঘরে সব টাঙানো আছে।

হুঁ মায়া, ওরা সব জানে। বলেই কালি চলে গেল।

কালু বলল,—মেজদির বিয়ের পর থেকেইত, তুমি আর মুড়ি ভাজনি।

ছোট বোন ছবি, ভাই এর সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই, তুই ঠিকই বলেছিস মেজদি কি সব নিয়ে চলে গেছে ?

কুণ্ডু গিন্নী মাসিক কেনাকাটা করে ফিরছিল। কিন্তু ঠিক তিনসন্ধ্যায় মায়ার ঘরের পাঁচসুরো কথা কানে যাওয়ায়, উৎসুক হয়ে ঢুকে পড়ল।

মায়া যে মাণিককে আলাদা করে দেবে—এই কথা তার কানেও গিয়েছিল। কথাটা ক-জনই নয়, একরকম রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। কারণ কে এমন মেয়ে আছে যে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে বাবার সংসার মাথায় করে ধরে রাখতে পারে। জীবনের সমস্ত সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কোন বিবাহিত মেয়ে ভাইদের মানুষ করতে পারে। যে স্ত্রী স্বামীর সুখে সুখী হতে চাইল না সে কিভাবে সুখী হয়, না হতে পারে ? তাই মানুষের কাছে একটা বিরাট পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সে পরীক্ষায় সফল, যখন তার বাবা আবার বিয়ে করে সংসার পাতল।

তাই মায়া সকলের মনে মায়ার কারণ হয়েছিল।

কুণ্ডু গিন্নী ঝালা তাই ছবির কথাটা শুনে, নিজেও মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু যাদের টাকা বাচ্চা বিয়োয়, তাদের গর্ভদশা বড় ক্ষুধার্ত। ক্ষুধায় মানুষ সময় সময় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ঝালাও বলে উঠল, সত্যি রোমা তোদের মেজদির বিয়েতে তোদের সব ফুঁকে গেছে। তারপর মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁগো, সত্যি বলছি, আমার একদম খেয়াল ছিলনা, মাস যে শেষ। তা তুই টাকাটা গুনে দিয়ে তোর জিনিষ তুই ছাড়িয়ে আন না মা। দেখেছিস তো কর্তা, কিছুতেই দেবেনি। কিন্তু তোর বোনের বিয়েটা কেন আটকে যায়, তাই আমি নিজে টাকা গুণে দিয়েছিলুম মনে আছে ? একটু থেমে আবার বলল তারপর বিয়ে তো হয়ে গেল আজ মাস খানেক। ভগ্নিদায় থেকে উদ্ধার তো পেলে মা, এবার আমাকে উদ্ধার করো।

মায়া তখনও মুখ খোলেনি। তাই দেখে ঝালা বলল, আর যদি না

পারিস···বলেই বলল, বেশত, সুদটুকু অন্ততঃ মিটিয়ে আয় না। এই ক-জনের কথা, বলেই চারদিক দেখে নিয়ে বলল সুদে টাকা খাটানাও যে পাঁচজনের গাত্রজ্বালা। এখুনি বড়লোক বলে হাফসুল লাগাতে বলবে। বলত কি বিপদ, জুতো যদি ভালো হয় তবে হাফসুলের প্রশ্ন কেন ?

মায়া বলল—কাকীমা, নিয়েছিলুম তো, পঞ্চাশ টাকা,—তাও রুপোর জিনিষ কটা সব বন্দক রেখে। যাক গত মাসের সুদ কি দিয়ে আসিনি ? মাত্র তিনদিনের জন্যই সারা মাসের সুদটা নিয়ে ছিলে মনে আছে ? আজও গিয়ে শুনবে মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।

ঝালা বলল—হ্যাঁ, জানি মা জানি। তোমার কাছে আমার মান থাকবে। তুমিও তো জান মা, তোমার জিনিষ ক্ষয় হবে নি।

মায়া বলল—কি জানি, আমি পরশু টাকা কাকাবাবুকে দেবার পর, জিনিষের খোঁজ পড়ল। দেখি তোমার নাতনি কাকে দিয়েছিল, এনে দিল।

ঝালা বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হতে পারে। মোহিনী, ভাই এর বিয়েতে যাবে বলে চেয়ে দিল বটে। দেখ, দেখি ঝি চাকরাণীর সখটা কি রকম ! যাক, মিটিয়ে এসেছিস, ভাল করেছিস। কেন বাবা পরের জিনিষ অপরে পরে।

মায়া বলল—আমিও তাই কথাটা শুনেই, উপোষ দিয়েও ছাড়িয়ে এনেছি।

ঝালা চোখ কপালে তুলে বলল—তবে, তবে আমাকে শুনাতে নাই ? জানলে আসতুম নি। ভাবলুম, যাই ভাইবোনে শুনলুম গণ্ডগোল হবে, —দু কথা বলে থামিয়ে দেব। তারপর ইশারা করে বলল, বোনের বিয়ের দেনা, ভাই-এর বিয়ে থেকে শোধ হয় নি ?

মায়া বলল—কি টাকা কত টাকা পেয়েছে ; তা আমার জানার দরকার নাই। ভাইকে সংসারী করতুম, তবে আরও একটা বোনকে পার করে। কিন্তু ভাই যখন নিজের কাজ নিজে করে নিল, তখন আমার কাজ হালকা হোল। সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও হালকা করে দিলুম। কেননা আমাদের গরীবের সংসার—পেট চালানো দায়। ওতে কেন ওদের কষ্ট দিই। ওদের পেট কম, উপায় বেশী। বলেই বলল—নে ভাই, তোকে সাতদিনের চালাবার মত, চাল থেকে আরম্ভ করে বঁটি পর্যন্ত দিলুম। উপরওয়ালার কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করি, তোরা সুখী হ !

ঝালা বলল—সবারই সুখ কামনা করছ কিন্তু নিজের··· !

মায়া বলল—আমারও ঐ ভগবান—বলে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে গেল।

॥ তেরো ॥

অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার লড়াই যারা করে, তারা সংসারে জেদী মানুষ। আর যারা জেদী মানুষ হয়, তারা সেই দিকেই একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। চালাকীর ধার ধারে না, বুদ্ধির বিকৃতি ঘটায় না। মোট কথা, কোন দিক দিয়েই তারা ধার করে না। তারা ভাবে, ধারী হয়ে থাকাটাও আপন সত্ত্বার অবমাননা করা।

তাই, তাদের ঐ নির্দিষ্ট জিদের মাহাত্ম্য তারা ছাড়া বোঝবার উপায় নাই। মায়া সংসারে একের পর ঘা খেতে খেতে সে মনকে এমনভাবে শক্ত করে নিয়েছিল, যে মানসিক বুলেট তার শরীরে সজোরে আঘাত করে বটে, বেঁধে না। বারে বারে ফিরে আসে। তবে গায়ে দাগ হয়ে থাকে। সেই দাগই হোল তার চলার পথের দিশারী। মা মারা যাবার পর সে আপন টানে সবাইকে এককরে বাঁচাতে হবে, এটাই বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু বাঁচার ও বাঁচাবার পথ যে অতি বন্ধুর, সেজানত না। কাজের মধ্যে যে শিক্ষা, তাই হোল আদি শিক্ষা। মায়ার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। এবং তাও তার হাতে কলমে। তাই ভুলে নাই, চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার বারই তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। সেই কারণেই গুচ্ছমূলের মত নূতন নূতন মূল বের করে নূতনের মধ্যে দিয়ে পুরানোকে মনে রেখেছে। মেজ বোনের বিয়ের পর তার কিছুটা স্বস্তি এসেছিল। যদিও ধার দেনায় তার মনের উপর চাপ এসেছিল। কিন্তু বাবার অপর সংসার পাতা, তাকে দুঃখের মধ্যে—অন্তঃজ্বালার মধ্যে ছুঁড়ে দিলেও—পরমুহূর্তে বুলেটের দাগগুলো দেখেই আরও দেহাবরণীকে শক্ত করে নিয়েছিল সে। কান্না হাসি মানুষের জীবনে চিরন্তন সত্য। কিন্তু যারা একই সঙ্গে যেমন কাঁদতে পারে, তেমনি হাসতে পারে; তারা পাগলের মধ্যে বিচার্য হলেও, যারা এই পাগলামী কাটিয়ে আপন পথে ফিরে আসে, তারাই সংসারে প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ।

মায়া অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। পিচ্ছিল পথ, সে আগেই জেনে নিয়েছিল। কিন্তু যখন আবার বড় ভাই স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করল, তখন সে পিচ্ছিল পথে বুড়ো আঙ্গুল টিপে টিপে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এ তবুত মানুষের কাছে বিপর্যয়, কিন্তু প্রকৃতির কাছে পার কে পাবে ?

হঠাৎ এসে হাজির হোল খরা। বড় গাছেরই পাতা ঝরে মুড়ো হয়ে গেল। তবে ফসলের জান তো মিছামিছি।

চারদিক মরুভূমির মত ধু-ধু করতে লাগল। ফুঁই ফাঁই বৃষ্টিতে মানুষ আশা করে ধান চাষ করল, কিন্তু সে ক-দিনেই শুকিয়ে দিয়া-শালাই কাটি মেরে ধরিয়ে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল।

মায়া যুক্তিবাদী, কারও কথা নিল না। কঞ্চির ডগা হুল করে সেই বালি মাটিতে গোঁজ গেড়ে, গেড়ে ধান রুইলো। আশা, বৃষ্টি আজ না হলেও আগামীকাল, তাও না হয় পরশু হবেই। তাছাড়া কুড়ে সে নয়। তাই অপরের হাসির বিষয় হলেও, ওটাই তার কাজের বিষয়। কিন্তু গতর খাটানোই সার হোল।

রবি শস্যের চাষ করল, কিন্তু তাও তথৈবচ।

এদিকে ঘরে খাবার নাই, লোকের ঘরেও কাজ নাই। ভারি চিন্তায় পড়ল সে। কি করে! তার উপর তাকিয়ে রয়েছে ঠিক গোঠে বাঁধা অন্ততঃ এক আঁটি খড় না হলেও একটু জলের আশা করে গরুর মত, ক্ষিদে পেটে ভাই বোন চারটে। মা-মরা তারা। কিন্তু মা থাকলেই বা কি করত ? সে দেহের রক্তকেও বুকে এনে স্তনের দুধ খাইয়ে খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে নিজে শেষ হয়ে যেত।

মায়াও তাই করল। সে ওষধির মত সংসারে নিজেকে বিলীন করে দিতে চাইল! গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল শহরে। শহর খরা মানে না। নূতন সাজে সব সময় সে সেজে থাকে। টাকার পো পাথর কাটে। কিভাবে ইট করতে জল পেল, নিরন্ন মানুষ কিভাবে তিন তলায় কাজ করছে, মায়া প্রথমে দেখেই তাক। কিন্তু সে-ও বুঝল, কে বলল মানুষ নিরন্ন। সবাই উপায় করেই খায়। তবেই ইঁট তুলে দিতে হয় রাজ মিস্ত্রীকে। কোদাল মেরে পাতাল কুঁড়ে জল এনে মসলা নিয়ে পিছু পিছু চলতে হয়। তবেই রাজমিস্ত্রী কর্ণিক চালায়—হয়ে ওঠে সুদৃশ্য বাড়ী! মায়া তাই করতে শুরু করল।

মোড়ের মাথায় চা-এর দোকান। মায়া গিয়ে দেখল—রাজা থেকে শুরু করে, জলবাহিনী, স্থলবাহিনী, পদাতিক, কি সিঁড়ি বাহিনী সবাই চুক্ চুক্ শব্দে চা টানছে। কিন্তু তার জলের টান। সবাই-এর মত চা-এর বদলে জল খেয়ে কাজে লাগে। তার কাজ হোল ইঁট জলে ভিজিয়ে সারিবদ্ধভাবে জড়োকরে রাখা।

দোকানদার তাকায়। কিন্তু তার দোকানের মেয়েটা, চুল বিনুনী, কোঁচা করে কাপড় পরা মেয়েটি; কাঁচের চুড়িগুলি উপর হাতে ঠেলে তুলতে তুলতে বলে—কিগো মেয়ে, তোমার চায়ে ক্ষিদে নাই ?

মায়া বলল—চা খেয়ে ক্ষিদে মেটে না। শুনিতো, বাবুরা মেজাজ রুখে। তবে আমার ক্ষেত্রে ক্ষিদেই মিটবে।

দোকানীর মেয়ে কণিকা দোকানদারের দিকে চোখ মেরে বলল—বেশ চা-টা এখানেই মাপবে তো ?

মায়া বলল—জল যখন এখানেই মেপেছে, চাও এখানেই মাপবে।

কণিকা বলল—দেখিস গো দিদি, আমার জলের দাম যে চা-এর চেয়ে ধরলে অনেক বেশী।

মায়া বলল—ভরসা করে তুমি জল দাও, আমার কথা নড়চড় হবার নয়।

চা-ওয়ালা—বামাপদ চেঁচিয়ে উঠল মানুষ জল চাইছে, জল দিবি। কি খাবে, না খাবে, অত দেখার তোর দরকার কি ?—তার জন্যে তো আমি আছি।

কণিকা বলল—জলটা ভোর থেকে লাইন দিয়ে ধরে আনতে হয় আমাকেই। কই ঘুমের দাম তো কেউ দেয় নি।

বামাপদ চেঁচিয়ে উঠল—বাজে কথা কহিসনিতো—কেন মাসের শেষে ছেঁড়া নাকি, এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করেদেখে নিয়ে পঞ্চাশটা টাকা নিসনি ? আর নিজের হাতে দিনে তিনবার চায়ে দুধ ঢেলে খাসনি ? তাই বলিরে জ্ঞাতি শত্রুর মত বড় শত্রু আর নাই।

কণিকা মুখ বাঁকিয়ে বলল—কোথাকার কে, দুটো আমড়া ভাতে দে।

ও আমার কে ?

বামাপদ বলল—উ-ও তোর মত খাটতে এসেছে। তুই কি খাটতে এসেছিস না বাবু হয়ে খাটাচ্ছিস ?

এতক্ষণে কণিকা চুপ করল।

বামাপদ বলল—ও-যা চাইবে, তাই দিবি। ওর টাকা কখনও মরবে নি। প্রথম দিন চা দোকানেই সবাই জেনে নিয়েছিল সরু গেঁটে, মুঠি বাঁশ বটে, কিন্তু ভারী শক্ত।

তাই মায়ার সঙ্গে বেশী কথা বলত না। সবার সময় মত মায়া হাজির হোত। সবাই সকালে চা জলযোগের সময় পেট ভরে রুটি আবার চা—কিন্তু মায়া একটি ফুলুরি ও এক কাপ চা খেত। এই খেয়েই তার চলতো তিনটে পর্যন্ত এক টানা কাজ। তারপর হাত, পা ধুয়ে গা কাপড় ঝেড়ে সোজা চলে যেত সহরের বাজারে। সকালের টাটকা মাল নাই। যাইহোক দামও সস্তা। মায়া ওর-ই মধ্যে দেখে, বেছে তরকারী অর্ধেক ও ভাতের চাল অর্ধেক কিনে নিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে এসে হাজির হোত।

ছায়া উনানময় শুকনো পালা জড়ো করে রাখত। মায়া পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে উনান ধরাত। তারপর হাঁড়িতে চাল তুলে দিয়ে—শাল জ্বালার মত জ্বালুন ঠেলে ঠেলে এক রকম তক্ষুনি ভাত নামাত। কালু ও ছবির জন্য আলু ও অন্য যা জুটত, তাই ভাতে দিত। তাদের ভাত জুড়িয়ে খেতে দিত। তারপর তরকারী চড়াত। এরই মধ্যে এসে যেত গোদাই মল্লিক। বি এ পাস করে, ভদ্রলোক, সদাশয় হয়ে রয়েছে। তারই মত ছোট জাতদের সঙ্গে। নিজের চেষ্টায় পাঠশালা খুলেছে। নিজের হাতে শিক্ষা—ছড়ি ধরে ছোটদের জন্য এবং মন কাড়ে বড়দের। তাদের জাগাবার জন্য। রাজনীতিতে লাল বাম বলে অস্তিত্বের লড়াই তাকে জোর কদমে বরাবরই করে যেতে হচ্ছে। হাঁক দিল—কিরে মায়া, তোর বোনের যে পড়া হয় নি। খেতে দিস কেন ওকে ?

ছবি তখন ভাতে বসেছে। ক্ষিদের চোটে গরম ভাতের জন্য বাম হাত পাখা নাড়ার মত বাতাস করছে ও ডান হাতে সেই গরম ভাতই মুখে তুলে ঘন ঘন জল খাচ্ছে।

গোদাইকে দেখে কালু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। গোদাই বলল—হ্যাঁ, বদমাইশটা তাহলে ভয় করে আমাকে। বুঝলি, তোর এই ছোট ভাইটা সবার চেয়ে এক কাঠি সেরা। এগিয়ে এসে বলল—পড়া করবি। কালু চুপ। পাঠশালা যাবি ? এবার কালু ছুটে দিদির কোলে উঠবে না, ভাত খাবে ভেবে পেল না।

গোদাই বলল—দিদিকে দেখছিস কি ? পড়া করলে খেতে দেবে, তারপর বলল কবার হোল ?

মায়া বলল—যা হোল, ঐ একবারই হোল।

গোদাই বলল—কি, এসব ছোটদের এই একবার হোল! ভাগে চাষ করিস তো। এখনই না হয় খরা।

মায়া বলল যার ঘরে বিয়ের যোগ্য, মেয়ে থাকে—তার পেট থাকো না পিছন ফিরে তাকাবার খেয়াল থাকে—কাপড়টা ছেঁড়া না ভাল।

যদিও আজ মেয়ে দেখিয়ে অনেকে অনেক কিছু করছে। পেটের ভাত রুজি রোজগার করে নিচ্ছে। তাহলেও আমরা এই নেংটি থেকে কাপড় চিনেছি। তবে তাদের মত উলঙ্গ থাকতে পারি নি। তাই জ্বলছি, পুড়ছি। ভগবান করুক, এই ভাবেই যেন বেঁচে থাকি।

গোদাই বলল—ও···হো জয়ার বিয়ে দিলি বটে। আমার কলঙ্ক ঐ মাণকেটা। তারপর বলল, জানিস, তোর মত আমারও ঘটে অনেক কিছুই আছে। কিন্তু ঘটাতে পারছি না। কি বলব বল, তে-রঙার কাছে নিজেও এক রঙা আর লোক জনের কাছেও তাই।

ভাবি কি জানিস, বাপ-ঠাকুর-দাদাদের মত নেশা করি—কি হোল, এমন দুলের ঘরে শিক্ষিত মানুষ হয়ে? অফিস করলে কেউ চিনতে পারত না। দিব্যি সবার মত গায়ে চড়িয়ে ছোটর ত্রি সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকতে হোত না। সবাই বলত গোদাইবাবু। আর কেন যে কি ছেমো ধরল ভগবানই জানে। নামলুম জাতকে শিক্ষা দিতে, উঁচু করতে। ওরে, এরা উঁচুতে উঠতে জানে না। জানে নীচু হয়ে—আমরা ছোট বলে গাধার খাটুনী খাটতে। আসলে কি জানিস, এরা মানুষের মর্যাদাই জানে না। তাই সবার মত উঁচু নীচুর প্রশ্ন তোলে—মানুষকে মানুষ চিনলে না। কি মজা গাঁয়ের কোনে আমাদের বাস। কে তাড়ি খেল, কে মদের ভাটা খুলে সবার সঙ্গে পেটের জ্বালায় সময়ে সময়ে নেশা করে গড়াগড়ি দিল, তার ঠিক নাই। ওরা চায় নেশা করুক—খাটি আমরা দ্বিগুন। লাভতো দুদিক দিয়ে। তারপর বলল—হ্যাঁরে সিধু ফিরেছে? তোদের কড়া জাতটার মধ্যে শুধু সিধুর মধ্যে তোর ছাপ দেখতে পাই। মনে হয় কি জানিস, তোরা দুজন সমান মাপের। একই উঁচুতে ফিটকরা সমতলে দুটো ছিদ্র। একই আলো দুজনকেই আলোকিত করে মানুষেরও চোখে এসে পড়ে। শুনি তোরা মামাতো, পিসতুতো, ভাইবোন।

মায়া বলল—হ্যাঁ, মাত্র ছ-মাসের বড় সিধুদা।

গোদাই কি ভেবে বলল,—গত নির্বাচনে জিততে জিতেতেও হারলুম।

কি করব ? সাদা পঞ্জাবী পরে কানুদা, আমার ঘর এসে এসে বন্ধু পাঠিয়ে, তার সঙ্গে মদ ধরালা। কিন্তু বিশ্বাস কর ব্যাপারটা দু-বন্ধু ছাড়া কাক পক্ষিও জানতনি। কিন্তু হাড়ে, হাড়ে চিনলুম, তে-রঙার হয়ে যখন আমার নামে সভা সমিতি তারপর জন সভায় ভাষণ দিয়ে বলতে লাগল, আর যাকে খুসী ভোট দাও, কিছু বলব না, কিন্তু গোদাইকে তোমারা আরও মোটা করনি। করলে সর্বনাশ তারও, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও। কারণ সে আমার কারণ সুধার—এক গ্লাসের ইয়ার বন্ধু। বলত, সর্বনেশেটা, কার হয়ে শ্লোগান দিল ? আমার, না, বিপক্ষর ঐ নাম-জাদা নাড়ীধরা মানুষটার।

তবুও দেখলুম, মানুষ আজ মানুষ চিনেছে, নইলে আমি মাত্র পাঁচ ভোটে হারি !

আসছে বাঁধভাঙা বন্যা, দেখি কানুবন্ধু আমার কান বাঁচায় কেমন করে।

এই তো সিধু, এসো। সিধু এসে দাঁড়াল।

গোদাই বলল—সিধু তুমি বড় বুদ্ধিমান। সেদিন যদি নদী ঝাঁপিয়ে না পালাতে তবে পুলিশ বোধ হয় হাড় কখানা তোমার গুঁড়িয়ে দিত। দারোগাও চিনে দেখলুম ।

হাঁকল—সিধু এস, দরকার আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সিধু বলল—চলুন, আপনি, ওদিক দিয়ে পেঁছাতে না পেঁছাতে আমি আপনার কাছে পেঁছে যাব। দেখ দেখি, সাঁওতাল রবিকে নিয়ে কি কেলেংকারীতে পড়েছিলুম। যাইহোক ছোঁড়াটা বাঁচল।

গোদাই বলল—বুঝলে সিধু, তোমার ঐ মুখের জ্যোতিখানা যে একবার দেখবে, সে-ই ধরে নেবে এর মধ্যে কুল কাঠের আঙরা আছে। ধিক, ধিক করে জ্বলছে, জ্বলে থাক—দেখবে একদিন অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলবে। মুখে তোমার কেউ নাম করবে না। কিন্তু ভয় খাবে। আর বোবার মত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এটাই হোল পণ্ডিত বলে নাককাটা বুদ্ধিমান স্বার্থপরদের ভয় করার আসল ভাষা। কারণ মুখ তাদের গরুর জাবর কাটা বাপ-ঠাকুরদাদাদের টিবির পোকার মত, নাম কুরে কুরে খাওয়া।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ।

গোদাই আবার আরম্ভ করল আচ্ছা সিধু তুমি থাকতে তোমার

মামাতো বোনটা এত কষ্ট পায় দেখো কি করে ?—যদি তোমারই বোন হোত ?

সিধু বলল—ওর বোধ হয়, আমার চেয়ে হাড়ের সংখ্যা একটা বেশী। আমি কি ওকে দেখব, ও-ই আমাকে দেখে। যখন বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হই তখন ও-ই আমার রসদ। বুঝলে মল্লিক কাকা, রায় কর্তা ওর চোখের চাউনিতে বলেছিল—তুই তোর বাবার দুর্গা নও—মা সেজেছিস যেন জগৎজননী জগদ্ধাত্রী। আমরা দেখে শুনে বলছি হ্যাঁ ও আমাদের জগদ্ধাত্রী। কিন্তু এখন সব মানুষপূজা কিনা ? তাই আসল দেবদেবীর প্রমাণ মানুষের পূজা নাই বলে ও আজ দূরে সরে আছে।

গোদাই বলল—না সিধু, তুমি আবার বাবু ভাষায় কথা বলছ। সব মানুষের মধ্যেই দেবতা আছে। আমরা তাঁকে দেখতে পাইনি। আসল কথা, কেউ দেখতে চাই নি। আশা করব তুমি মানুষকে দেবতা ভাববে, বিশেষ মানুষকে নয়। যাক মায়া, তুমি যদি জগদ্ধাত্রী, তবে চার হাত মেল। চলি সব, সঙ্গে সঙ্গে সিধুও চলে গেল।

ছায়া বলল—দিদি, কি এত আক্‌টেন শুনলি ? পেটে, কুত্তো থাপাচ্ছে —কই খেতে দিয়ে লেক্‌চার মারুকতো দেখি !

মায়া বলল—তবে এতক্ষণ কি শুনলি। তোদের জন্যই মানুষটা মেকি মানুষ না হয়ে, আমাদের ছায়া হয়ে আছে। বলত, যারা বলে দেব, তারা কি দিয়েছে। ওতো তবু তোর ঘরে দাঁড়িয়ে লেক্‌চার সেরে গেল। তাদের কখনও ভিটেয় উঠতে দেখেছিস ? মা থাকলে ওর কি গুন আছে বুঝতিস। কে তোদের শেখাল যে শিখবি, মানুষের কদর। খেতে জানিস, খাচ্ছিস। তেমনি মানুষ চিনতে হলে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। পণ্ডিত, জ্ঞানি লোকের লেখা বই পড়তে হয়। যার শুধু পেটের ক্ষিদে রয়েছে সে মানুষ জীব, আর যার মধ্যে ওর সঙ্গে মনের ক্ষিদে রয়েছে সেই যথার্থ মানুষ। তারপর বলল, কথা শুনে পেট ভরে গিয়েছিল কিন্তু এবার সত্যি ক্ষিদে উঠেছে, ভাত দে।

॥ চৌদ্দ ॥

মঞ্জু মাল হিন্দু থেকে নাসির-মিস্ত্রীকে বিয়ে করে মঞ্জু বেগম হয়েছে। মায়ার উপর তার বড় রাগ। মঞ্জু, সেদিন নাসিরকে বলল—যোগাড়েরাতো স্পেশালিষ্ট নয়, যে ডাক্তারদের মত এক রকম রোগীই দেখবে। এক-এক জন এক এক দিন এক এক রকম কাজ করবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার মাথায় যেন বাজ পড়ল। সবাই, এমনকি নাসির পর্যন্ত মায়ার মলিন মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু মায়া পিছুপা নয়। সে সে-দিনই সিঁড়ি বাহিনীতে যোগ দিল। পর পর আটখানা ইঁট মাথায় একের পর এক সাজিয়ে যখন সে ধাপ ভেঙে ভেঙে উপরে উঠতে লাগল, তখন খালি পেটে মায়ার যেন প্রাণ বের হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু মনের জোর অত্যাধিক তাই কিভাবে যে সে ক্রমশ ইঁট বহে নিয়ে যেতে লাগল সেই জানে।

মঞ্জু আজ ইঁট ধুয়ে সাজিয়ে রাখছিল। সে মায়ার দিকে তাকায় আর ইঁট গোছায়, কিন্তু তাকে গোছানো বলে না। এদিকে ইঁটের টান পড়াতে হেড মিস্ত্রী উঁকি মেরে দেখে বলল—ওগো মঞ্জু বল বিড়াবিড়ি করবি যদি, সে আছে কুরুক্ষেত্র। কিন্তু এখন রমণের ঠিকের কাজে এসেছিস। চুক্তির মধ্যে কাজ সারতে না পারলে, লাভের লক্ষ্মীপূজো হয়ে যাবে। তোর কি—ঢাক বাজাবি পয়সা নিবি। বাঁধা যায়, আছে রমন আলি।

মঞ্জু চেঁচিয়ে উঠল—কেন আমি কি ইঁট গোছ করে দিতে পারিনি?

রমন বলল—দেখ, সবাই কড়াই খুন্তি নিয়ে রান্না করে কিন্তু ক-জনই মাত্র—রাঁধুনি বলে কাজ বাড়ীতে রান্না করে—তাহলেই বোঝ, খুন্তি ধরলেই রাঁধুনী নয়।

মঞ্জু বলল—বেশ, তবে আমি ইঁট বহে নিয়ে যাচ্ছি। কে ইঁট ধুয়ে সাজাবে সাজাক।

রমন বলল—আগে যে ইঁট ধুয়ে সাজাচ্ছিল সে-ই সাজাবে।

মায়া বলল—আমি ইঁট সাজানো স্পেশালিষ্ট নই তো?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

যাক তবুও নিস্তার। কিন্তু ইদানিং তার কি যে হয়, কিছু বুঝতে পারে না। ফুলুরি-চা খাবার পরই গলা বুক জ্বালা করে মুখে জল উঠে। প্যাচ-প্যাচ করে থুতু ফেলে। সময় সময় পেটটা চিন্ চিন্ করে উঠে। মায়া ইঁট ধোওয়া বন্ধ করে, উপর পেটটা চেপে ধরে। কখনও বা

পায়খানা ছোটে। কিন্তু তাহলে কি হয়—কাজের শেষে যায় বাজার, তারপর সোজা ঘর। ছায়াও তৈরী। ভাত হোল, তরকারীর আনাজ কাটতে বসল। বেগুন পোকা নয়, পাকা। বলল দিদি, একটু দেখে বেগুন কিনবিতো ? সেই পয়সা যায়, আনাজ কাজে লাগেনা।

মায়া বলল—দেখেই কিনেছিরে বোন। পাকা দেখে কটা নিলুম। গতকাল যে শাকভাজা করেছিলি, আজ ঐ পাকা বেগুন কটা দিয়ে একটা ডালনা কর না। জয়ার বিয়ের দিন অভিরামদা কি চমৎকার চচ্চড়ি টুকু করেছিল। আরতো মাছ জুটবেনি, তাই শাক বেগুনই মাছের কাঁটা পড়েছে বলে খাব আর কি ! সত্যি বলছি তরকারীর স্বাদটুকু এখনও মুখে লেগে আছে মনে হচ্ছে।

ছায়া বলল দিদি সবই আকাল। ঐ যে তেলাকুচার শাক ? ভাবলুম আজও যাই, বনে হয়ে মরেছে, কার-ই বা দরকার। ওঃ বাবা ! পালগিন্নী তেড়ে আসবেনি,—ফল পাকলে তার টিয়া খাবে।

আমি বললুম—কটা শাক তুলছি—

সে বলল—একে মাসাধিক কাল জলের বাষ্প নাই, উ-ইযে বেঁচে আছে সেই ভাগ্য—আর বলে কিনা শাক তুলছি। আমি আর কিছু না বলে মুঠো খানেক তুলে পালিয়ে আসতে পথ পাইনি। তাই ভাবি,—চাষে হলেও……।

মায়া বলল—হ্যাঁ বোন, যাদের সময় খারাপ চলে ব্যাঙেও লাথি মারে।

ছায়া বলল—দিদি, এ-আলুর, কি আর খোলা ছাড়াব ?

মায়া বলল—দেখ আমাকে হাজারো বকাসনি। একে আমার পেটে লাগছে। শোন, যেমন পয়সা, তেমন জিনিষ কিনব তো ? বিক্রি করে ওগুলো ঝাঁকায় পড়ে রয়েছে, এক টাকার কম দিলে না। এক কাজ কর, ন্যাকড়ায় বেঁধে ভাতে দে। নইলে ভাত বেছে বের করতে পারবি, কিন্তু ও-যা আলু, বের করতে পারবিনি।

ছায়া হেসে উঠল—হ্যাঁ দিদি, বলেছিস ঠিক। আমাদের কালো পাঁঠিটার লেদাড়ী গুলোও ওর চেয়ে বড়।

মায়া হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠল যাক। যা করছিস কর, পাগলামী করতে হবে নি। তারপর বলল, এরই মধ্যে দুবার পায়খানায় গেলুম তবুও যে পেটের ভার কমেনি। উপরন্তু পেট যে বিন কিন ব্যথা করেই যাচ্ছে, আমাশা হলেই তো গেছি।

ছায়া চেঁচিয়ে উঠল—আমাশয় হয়েছে, তাতেই তুই শাক ডালনা খাবি। কেন দুটো কাঁচকলা আনতে পারতিস, ভাতে ভাত খেতিস।

মায়া চেঁচিয়ে উঠল—কুনি শুধু আমার চিন্তা করলে, তুই খেতিস কি? দুটো ভাতে দিয়ে খাবার আলু কেনার যাদের পয়সা নাই, তাদের কাঁচা কলা! চাকরে বয়ে আনা বাজারে বাবুদের খাবার—জোড়া দেড় টাকা।

চাঁদু ঘর থেকে বের হয়ে বলল—বেশত দুটো আমাশার বড়ি কিনে আনতে পারতে তো?

মায়া বলল—তুই কত উপায় করে দিদির হাতে দিচ্ছিস?

চাঁদু আর কিছু না বলে চলে গেল।

পরের দিন মায়া, ঐ অবস্থাতেই কাজে গেল।—নইলে গোটা সংসারটা যে দাঁড়িয়ে উপোষ যাবে। বার কয়েক পায়খানা হোল। দু-বার বমি করল। একবার গোটা গোটা গত রাতের শাক-শুদ্ধ ভাত উঠল। আর একবার সবুজ জলের মত শুধু পিত্ত। তিনবার কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ফেলল। পর পর তিন ঘোঁট করে জল খেল—তথাপি স্বাভাবিক স্বাদ এলো না, সারামুখ তেতো যবক্ষার। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল। মায়া ভাতে বসল মাত্র—খেতে রুচি হোল না।

সবাই বলল—রোদ লেগেছে। চড়া রোদে একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকায় আমাশয় করেছে, তাই রুচি নাই।

গোদাই মল্লিক, ঠিক সেই সময় এসে পড়েছিল, বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই ডায়গোনেসিস করেছিস। তোরা আমাদের ডাক্তার শিবের রুটি মারলি। শোন, থানকুনি পাতা, আর মুশোকানি থেঁতো করে রসটা সকালে সকালে খা-তো দেখি, দুদিনেই আমাশার পো ঘর ঢুকে যাবে।

মায়া তাই করল। আপাতত চলনসই—কাজ বন্ধ হোল না। কিন্তু আমাশয় কম মনে হলেও, গলা বুকজ্বালা কমল না। বরং অম্বলের ঢেঁকুর দিতে লাগল। পরের দিন আটা কিনে আনল, ভাবল চা ফুলুরি খেয়েই অম্বল হচ্ছে, হাতে তৈরী দু-তিন খানা রুটি নিয়ে যাবে।

ছায়া বলল—দিদি রুটি তোর ত দু-চক্ষের বিষ!

মায়া বলল—অভাবে মানুষ বুনোকচুও পায়নি।

প্রথম দিন রুটি দুটো কোন রকমে খেল, কিন্তু পেটের কষ্টের কোন কিছু লাঘব হয়েছে বলে মনে করল না।

দ্বিতীয় দিন কাজে বের হওয়ার সময় কালু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল,

কি রকমভাবে দেখে ফেলল, সে বায়না ধরল দিদি আমায় রুটি দে।

ছায়া ভুলিয়ে নিয়ে যেতে গেল, কিন্তু তার আর কান্না থামে না। ছায়া কত বোঝালো। সকালে কখন রুটি হোল দেখনা—ভাত আছে, তাই দেব।

ছবিও কখন দেখে ফেলেছিল। সেও ভাইয়ের সঙ্গে বায়নার তালে তাল দিয়ে বলল, কেন ঐতো, বাসি রুটি দিদির পেট কাপড়ে।

মায়া আর কোন কথা না বলে, পেট কাপড় থেকে রুটি তিনখানা ভাই বোনের হাতে ভাগ করে দিয়ে দিল।

ছায়া রাগে ছবির পিঠে সজোরে কিল কষিয়ে দিল। পেটের ভিতর জিনিষ লুকিয়ে রাখারও যো নাই।

মায়া বলল—আচ্ছা, জেনে শুনে কেন ওদের মারিস! তোরও কি ইচ্ছা হয় নি, দুটো রুটি পেলে খেতুম? ওরে বোন, সবাই সব কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু পেট কারও কিছু সহ্য করে নি। ও জিভ কখনও লোভ সামলাতে পারে নি। বলেই ধীরে ধীরে গামছাটা আপন মনে ভালকরে গোছ করতে করতে কাজে বের হয়ে পড়ল। একবার চিন্তা, একবার দুঃখ, একবার আনন্দ! সে কোথায় পা ফেলে শহরের দিকে এগিয়ে চলল তার হদিস ছিল না। যাদের আছে, তারা সকালে ঐরকম কত বাসি রুটি কুকুরকে দেয়, গরুর ডাবায় দিয়ে আসে। আবার কত মানুষ, কাক পাখীকেও খাওয়ায়। আর তাদের এমন কেউ নাই, যে অমন দুটো বাসি রুটি তাদের দেয়। ছোট ছেলে তারা, কি বুঝবে, দিদির পেটে কিছু পড়বেনি, হতভাগী সারাদিন একরকম উপোষে কাটাবে, তবু ও দুটো রুটি পেটে পড়লে কিছু খেয়েছি বলে কাজ টানতে পারে। কিন্তু না খেতে পাওয়ার মনোকষ্টে আজ তাকে মনমরা করে তুলল!

চিন্তার শেষ নাই, আচ্ছা মানুষ, কাক পক্ষিকে ডেকে খেতে দেয়। বামুন গিন্নী সাত সকালে পায়রা ডেকে গমভাঙা খুদ ছড়িয়ে দেয়। তারা খপ্ খপ্ বক-বকম্ করতে করতে খায়। তারপর ছাদে খানিকক্ষণ বসে, কেউ বা সঙ্গে সঙ্গে নানা বাহারে আকাশে উড়ে যায়। সত্যই কি পশু পক্ষিরা মনে রাখে, পুণ্যি হয়? আর আমাদের মত হা-ভাতে মানুষকে দিলে বুঝি মনে রাখি না। পুণ্যি হয় না। আমরা কি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করি?

এটাও ঠিক আমরা পায়রার মতো বাকুরতে পারি না, আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা করি, গালাগাল দিই?

সামনেই তো বামুনদের বাড়ী, তারা জানে খেটে আনলে আমাদের হাঁড়ি চড়ে। এখন খরার কবলে পড়ে, তাও সবার সবদিন জুটে না। পাশেই পালেদের কত আছে, কিন্তু কখনওতো একমুঠো খুদ আমাদের ধরে না। মোহিণী ঘোষের দোকানে ধার চাইলে, একরকম দূর দূর করে তেড়ে আসে। হ্যাঁ আমরা গরীব, আমাদের কেউ নাই, তাই কিছু নাই। তারপর মনে মনে ভাবলো কে বলল—আমাদের কিছু নাই? আমাদের অন্তর আছে, দরদ আছে, আর আছে বুকভরা ভালবাসা। তাই ভাইবোন আজ রুটি নিয়ে যখন খাচ্ছিল, তখন কি আনন্দই না লাগছিল। পায়রা বাকুরতে বাকুরতে খাবার সময় দেখে যে আনন্দ হয়, ও আনন্দ যখনকে তখন। ও তো চোখের কাজল। কিন্তু যে আনন্দ আমি দেখলাম, ও চোখে লেগে থাকার আনন্দ নয়, হৃদয়ে গেঁথে রাখার আনন্দ, মনের কাজ কাজল, মুছে যাবে না। ওর চেয়ে আরও মনে রাখার, ছোট বোনকে রুটির বায়না ধরার জন্য পিঠে কিল কষে দেবার জন্য, সে তো কান্নাকাটি করল না, রাগে ফেলে দিল না। বরং মজা করে খেল।

সে মজা বামুন গিন্নী কখনও দেখে না। অশিক্ষিত গরীব আমরা পাপ-পুণ্য কাকে বলে জানি না। জানি, সকলের মত বাঁচতে এসেছি বাঁচতে,—তবে তার পথ নানারকম। এতক্ষণে সে রমন মিস্ত্রীর ঠিকের কাজে এসে হাজি হোল।

দিন কাটতে লাগল। প্রকৃতিও বদলাতে লাগল। দেখতে দেখতে আকাশ নরম হোল। পর পর দু-তিন দিন আকাশে ছেঁড়া মেঘ দেখা দিল। হঠাৎ পশ্চিম আকাশ কালো হয়ে কালবৈশাখী ঝড় উঠল—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বাজ পড়ার দাপোট, তবুও মায়া কাজ থেকে ফিরে এসে, মাঠে ছুটল,—কোঁছড়ে তিল। জমিতে তিল বুনল। কিন্তু ক্রমশ ঝড় এমন বেগে শুরু হোল, কে কোন দিকে ছুটে পালাবে, তার পথ পেল না। সিধু-ই প্রাণপণে ছুটে ঘর পেঁছাল। পানু ঘোষ হর ঘোষের স্যালো ঘরে আশ্রয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মেয়ে-ছেলে মায়া আসতে পারল না। তাকে ঝড়ে ঠেলতে ঠেলতে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে নিয়ে চলল।

সেই ধূলি ঝড়ে পানুঘোষ দেখল একটা মেয়ে মাঠের মাঝে ঝড়ের সঙ্গে রীতিমত দাপাদাপি করছে। কিন্তু ক্রমশ ধুলো এসে তারও চোখ কানা করে দেবার অবস্থা করে তুলল। সে চোখ ঘঁষতে ঘঁষতে চোখ

বন্ধ করে ঝড়ের বিপরীত মুখে দাঁড়াল। তারপর আবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু সে আর মেয়েটিকে দেখতে পেল না।

বন্যার স্রোতের তোড়ে, মানুষ যেমন ক্রমশ জলের টানে নীচের দিকে নামতে নামতে পায়ের টিপ পেয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে। মায়াও তেমনি, ঝড়ের বিপরীত দিকে যেতে যেতে সামনে স্যালোর নালায় উঁচু নীচুতে পা ফেলে মুখ থুপড়ে পড়ে গেল। হাত বুলিয়ে দেখল রক্ত! নাকটা ছিঁড়ে গেছে। আবার এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল। কোমরে যাই হোক সায়া ছিল। কাপড়টা একরকম জড়ো পুঁটলি করে বগলে চেপে ধরল। কি করুণ! তবুও প্রচণ্ড ঝড়ের রক্ত চক্ষুর রোষ আর কমে না। সে নিরুপায় হয়ে কোন দিকে যাবে, কি করবে, এদিকে ওদিক দেখতে লাগল। ভয়ে আর তার দাঁড়াবার শক্তি টুকুই ছিল না। এবার সে নির্দ্বিধায় ঝড়ের বেগে ঠেলা হয়ে ক্রমশ আসতে লাগল।

এবার বরুণ দেবের রোষ! আরম্ভ হোল বৃষ্টি,—আকাশ পাতাল ভেঙে···। মায়া ঝড় খেয়ে একে আধমরা হয়েছিল, এখন বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো ছুঁচের মত তার সারা গায়ে যেন বিঁধতে লাগল। সে নিরুপায় হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কোন জায়গায়, কোথায় শুয়ে পড়ল, কিছুই সে বুঝতে পারল না।

॥ পনেরো ॥

বৃষ্টি থামতে চাঁদু ও ছায়া দিদির খোঁজে বের হোল। অনেক দিন পর বৃষ্টি! মেটেমেটে গন্ধ উঠছে, নীচু জায়গায় জল জমেছে। পথ জন-মানব শূন্য, কোথায় কোন শব্দ নাই। থমথমে ভাব। গাছপালা, বন জঙ্গল যেন ঝড় খেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে জল পেয়ে, আবার দম নিচ্ছে—তাই নীরব। ক্রমশ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। ভাই বোন—দুটি ভয়ে যেন প্রাণে মরতে বসল। মনে হোল দিদির কোলে গিয়ে লুকায়—তাই দি—দি বলে কান্না কাটি করতে লাগল।

সিধু ছুটে এল, বলল—সে কি রে? একে আমাশায় হেগে হেগে হাড় বেরিয়ে গেছে! তার উপর, হতভাগী—ঝড়জলে কোথাও পড়ে নাই তো! তখনও অন্ধকার গাঢ়ভাবে নামে নি।

সিধু বড় বুদ্ধিমান ছোকরা,—উপস্থিত বুদ্ধি ধরতে ওস্তাদ। ভাবল মায়া শিবোত্তরে তিল বুনছিল। ঝড় পশ্চিম থেকে পূর্বে বইছিল : সুতরাং দেখতে নাই, ঝড়ের গতিতে ঠেলা হতে হতে নিশ্চয় কোন গাছ তলায় গিয়ে পড়ে আছে।

শেষে দেখা গেল তার যুক্তিই অকাট্য। সে কোন দিকে না খোঁজ করে চলে এলো কুণ্ডুদের আমবাগানে। দেখল, মায়া বেচারী জল ঝড় খেয়ে মরার মত আম গাছের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তবে তার নিঃশ্বাস ধিকি ধিকি করে চলছে। নাক থেকে হাত সরিয়ে গোটা দেহটা গামছা দিয়ে ভাল করে মুছে হাঁক পাড়ল—চাঁদু, ছায়া, এখানে ছুটে আয়—মায়া এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে, সিধু তিলমাত্রা দেরি না করে ছায়াকে বলল তুই আলো নিয়ে এগিয়ে আমাদের রাস্তা দেখা, আর চাঁদু, তুই মায়ার পা দুটো ধর কাঠি ধরে রাখ। আমি ওর গর্দান থেকে কাঁধে তুলছি। চটপট হাঁট। বলেই আবার তাড়া দিল চল। পা ফেলে হাঁট, বলতে বলতে সিধু মায়াকে আনল ধনন্তরী নামী ডাক্তার শিবের কাছে। তিনি ফক্-ফক্ বিড়ি টানেন আর প্রেসক্রিপশন বানান। দেখেই বললেন—ওঃ, এই মেয়েটা ? ওকে ক-দিনই দেখছি, যেন ধুঁকছে। তা হোল কি হঠাৎ ? আজ ওকে কাঁধে করে আনতে হোল ?

চাঁদু চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—ঝড় খেয়েছে।

ছায়া কেঁদে বলল নাগো,···ডা···ক—তো—র—বাবু, দিদি মাঠের মাঝে, অ—জ্ঞান হয়ে গেছে।

ডাক্তার শিবু বললেন—এই যে-রে, একটা ইন্‌জেকশন ফুঁড়ে দিচ্ছি ওর জ্ঞান আসবে। উঠে বসবে। বলেই একটা ইন্‌জেকশন করলেন।

ছায়া বলল—দিদি এখুনি উঠে বসবে ?

শিবু আরও সহানুভূতির সঙ্গে বললেন হ্যাঁরে মেয়ে, দেখনা, তোর দিদিকে এখুনি ভাল করে দিচ্ছি।

ছায়া বলল—ডাক্তারবাবু, দিদির যে আমাশা করেছে। দেখ কিছু খেতে পারে না,— কেবলই বলে পেট কামড়াচ্ছে। একটু পেটের ঔষধ দিবে তো ?

শিবু বললেন—ওরে বোকা মেয়ে, তুই না কেঁদে, চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ। আমি সব ঔষধ দিচ্ছি। তারপর হাঁকলেন,—ওরে ও হেরো আমাশার জন্য আপাতত যা ট্যাবলেট আছে, তাই দিয়ে দে। মিক্‌চার আর

একটা টনিকও দিয়ে দেতো।

ছায়া বলল টনিক? হ্যাঁ, এবার, আমার দিদি নিশ্চয়ই সেরে উঠে দাঁড়াবে। সেদিন গোদাই কাকু বলেছিল বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সিধু জিজ্ঞোসা করল—ডাক্তারবাবু ওর অসুখটি কি? ডাক্তারবাবু তখন শেষ বিড়িটি ধরিয়ে হাঁকলেন—ওরে ও হতচ্ছাড়া হেরো, আমার বিড়ির কথা ক-বার বলতে হবে রে? ব্যাটার চাকরীটা দেখছি আর রাখতে পারলুমনি।

এই যে, এই যে, বলতে বলতে একহাতে বিড়ি অপর হাতে মিক্সচারের শিশিটা নিয়ে হাজির হোল।

ডাক্তারবাবু বললেন ওরে ও তালে ভোলা, ঠিক ভাগ মিশিয়েছিস তো? হারু কমপাউণ্ডার, এক বার শিশির দিকে তাকায়, আর একবার ডাক্তারের দিকে তাকায়।

ডাক্তারবাবু মারলেন এক দাবড়ি,—দূর। ফেল সব বলছি—ফেলেদে।

সঙ্গে, সঙ্গে ছায়া বলল—হ্যাঁ ডাক্তোরবাবু, ও কমপাউণ্ডার কিছু কম্মের নয়।—ওটাকে ফেলে দিতে বলো।

হারু ছায়ার দিকে তাকাল।

ডাক্তারবাবু দাঁত খেঁচিয়ে বললেন—এই চোখ করছিস যে! ওরে ক-বার বলব, ওটা ফেলে আবার মিক্সচার তৈরি কর।

হারু বলল—আচ্ছা ফেলছি। তখনও সে ছায়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। ডাক্তার ঝেড়ে মারলেন আবার এক দাবড়ি, ওরে হতভাগা গাধা, ওটা আমার সামনে ফেল, আমি নিজের চোখে দেখি। শালা, রোগী মরলে, তুমি শালা বাঁধা যাবে?

ছায়া চেঁচিয়ে উঠল—এই তো ডাক্তোরবাবু, দিদি চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। হারু পুনরার মিক্সচার তৈরি করতে ঘরে ঢুকে গেল।

ডাক্তার শিবুও আবার বিড়ি ধরিয়ে সিধুকে সিজ্ঞাসা করলেন কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ছোকরা?

সিধু বলল—বলছি, ওর কি হয়েছে?

শিবু তেলে বেগুনে হয়ে বললেন রুগী ভাল করতে এনেছ, ভাল করে নিয়ে যাও। তোমাদের আদাব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর কেন হে? —হ্যাঁ, যদি সব আমাশায় কথাটাও ঠিক উচ্চারণ করতে পারত।

পাশের বুড়োটি বলল—হ্যাঁ বাবু, তোমাদের রুগী সারবে কারণ যে রুগীকে উনি বিড়ি টানতে টানতে না খেঁচিয়ে উঠবে, সে রুগী শিবেরও আসাধ্য ! এ ডাক্তার ছেড়ো না, বুঝলে—আবার এনো।

॥ ষোল ॥

রোগ বাড়ে, মায়া আর সহ্য করতে না পেরে ডাক্তার শিবের কাছে যায়। ঔষুধ খায়, ভাল থাকে। এইভাবে ডাক্তারের কাছে মায়ার চিকিৎসা কোটা হিসাবে।

ডাক্তারের নাম আসলে শিবু সেন। কিন্তু তিনি গরীবের মা-বাপ। শহুরে শাসক গোষ্ঠির একজন। তিনি হলেন অখ্যাত ওয়ার্ডের বিখ্যাত কমিশনার ডাক্তার শিবু সেন। কিন্তু মানবতার গুণে, কেউ শিবু বলে না—মহাদেব তিনি সকলের কাছে ! শিব সেজেছেন। হাত বাড়িয়ে যা দেন তাই পকেটে রাখেন, কোন রুগী কত টাকা দিল দেখেন না।

মায়ারও বিরাট উপকার। যাক সাময়িক কষ্টের পর বেশ কিছু দিনের মত খেটে খাওয়ার রাস্তা—পরে যা হয় হবে। আসল কথা, কেউটের দশংনেই মৃত্যু, তাকে মারাবার ক্ষমতা নাই, দুধকলা খাইয়ে যতদিন থামিয়ে রাখা যায়। সেও বাড়ুক, তুমিও মৃত্যুর দিন গোনো।

আস্তে আস্তে প্রকৃতি বদলে গেল। রোদ জলের গড় প্রায় সমান সমান হওয়ায় ফসল ভালই ফলছে। বর্ষার আগেই উচ্চফলনশীল ধান করেছিল। এখন মায়ার দিব্যি চলে যাচ্ছে। তবে টাকার হাতটান বড্ড। তার জন্য সে পাটী বাঁধা ধান দেখে না—লোকের ক্ষেতে খাটতে বের হয়। শীতে আলু, গম করল, সিধু তার এক রকম অভিভাবক। তারই হাতে মায়ার নূতন নূতন চাষের হাতে খড়ি। মেজ জামাই পলাশ চাষের সময় আজও দিদিকে সাহায্য করে। তারপর ছায়ারও স্কুল পাঠ-শালা বন্ধ।

সিধুও মাঝে মাঝে লেগে দেয়। মায়া পুরুষের মত দড়ির মাপে আলুর দাঁড়া টানল। জল ছড়িয়ে, সার ছড়াল। তাতে ছোট কোদাল দিয়ে মাটি মিশিয়ে আলু বসাল। তারপর আলুর দাঁড়ায় মাটি ধরাল ও সপ্তাহে, সপ্তাহে জল পাওয়ান দিয়ে দিয়ে ভাল আলু ফলাল। সকলেই

দেখে অবাক! তার আর ভাগে চাষ করার জমির অভাব হোল না। মায়া সদ্য বছরেই দেনা শোধ করল।

কিন্তু খরার শিকার জগু মালিকের অবস্থা তখনও ঢিলে। সে পৃথিবীর আবর্তনের মতো, ঐ পথে ঘুরে যেত। কিন্তু ভিটেয় উঠত না, কিংবা ছেলে মেয়েদের খোঁজ নিত না। রাস্তায় অনেক সময় দেখা হোলেও, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু মায়ার ঘরে লক্ষীর উদয় হতে—ইঁদুরে অত্যাচার দেখে কে! জগু যেচেই উঠল। মায়াকে বলল—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ শুনেছি সব। কিন্তু আমারও বিপদের উপর বিপদ। আর বলিস কেন, তোর মাকে সাপে কাটল—হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পথে ভাল গুনিণ জুটে যাওয়ায় গদ খাইয়ে সেরে উঠেছে। এখন তার মাথার তেলো জ্বালা করে, চোখেও অন্ধকার দেখছে। গুনিণ আনারস খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু দাম পাই কোথায়? তাই এলুম। ধার-ই—নাই কটা টাকা দে-মা, ক-দিন বাদ দিয়ে যাব।

চাঁদু ঘর ঢুকে গেল। তারপর ঘরের ভিতর থেকে মায়াকে ও ছায়াকে ডাকল। কিন্তু মায়া ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া ঘরে ঢুকে গেল।

জগু কোন উত্তর না পেয়ে অপমানবোধে দাঁড়িয়ে রইল না। উহা ঢাকা দেবার জন্য নূতন ঘরের কাঠ, কাঁড়ি, দেওয়াল, সবই লক্ষ্য করতে লাগল। কারণ সে এখন ঘরের দেওয়াল দেয়—বলল—হ্যাঁরে দেওয়াল বুঝি সিধুই দিয়ে ছিল?—তা, আরও এক পাট দেওয়াল বেশী দিলে ঘরটার বেশ মানান হোত। যাক তোর হিম্মত বলেই, ঘর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—হ্যাঁ মা, যে যেমন খাটে ভগবান তাকে তেমন ফলও দেয়। একের পর এক বিপদ। যদিও বেড়া দিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর করেছি, উপর ছেঁদা, জল ঝড়ে ছেলেপুলে জিনিষপত্র নিয়ে একোণ ওকোণ হয়ে, হোলি খেলা করি। মায়াও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিল। সঙ্গে সঙ্গে ছায়া চাঁদুকে বলে উঠল দাদা, দিদির দয়ার প্রাণ—দু-হাতে বিলিয়ে দিল বলে।

মায়া জগুকে বলল—জানব কি করে? তুমিও ছেলে-মেয়েগুলোকে চিনতে পারলেনি।

জগু, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মায়া ঘর থেকে, চারটে এক টাকার নোট জগুর হাতে দিয়ে বলল—যাও চালিয়ে নাওগে।

জগনু দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে বলল—এতে তোর মায়ের চলবে, কিন্তু আমাদেরও ত…

মায়া বাবাকে চিরকালই চিনত, তাই সে যে কিছু চালের মাগন-প্রার্থী ধরে নিয়ে বলল, বেশী ধান হয়নি, ওরই কিছু দিচ্ছি। নিয়ে যাও। বলে চাট্টি চাল নিয়ে এল।

জগনু সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

ঠিক দশ দিনের দিন, আবার জগনু এসে হাজির। আজ এসে নিজেই তাল চাটাইটা টেনে নিয়ে বসে বলল—আবার যে এলুম রে মা,—ব্যবসা বন্ধ। আমিও ওদের তদারকী করব, না খাটতে বের হবো ?

কোথায় ছিল কে জানে, সিধু এসে, বাঘের মত ঝাঁপ ধরল—কে তুমি ? এসে ছেলেমেয়ে বলে টাকা, চাল নিয়ে যাও ?

তারপর মায়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁরে মায়া, সেদিনের ধার শোধ করতে এসেছে তো ?

মায়া চুপ।

সিধু ছায়া ও চাঁদুর দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁরে চার টাকা, কেজি খানেক চালত ধার নিয়ে গিয়েছিল ?—কই কিছুতো আনতে দেখলুম নি,—বলি মায়া, ও মায়া, শুধু টাকা চারটেই কি শোধ করল ?

সিধুর তুম্বি-হম্বিতে জগনু রিতীমত ভয় খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

সিধু বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে তোমার ছেলেমেয়ে ? মামী মরার পর মাত্র আট দিনের বিয়েলি মেয়েটা স্বামীকে ত্যাগ করে, ভাই বোনদের চিনল, আর বাবার বয়স কি পঁচিশ ?—সে তার সংসার চিনল না। ছেলে-মেয়েগুলো কি করে মানুষ হবে দেখল না, আবার অন্য জায়গায় উঠে গিয়ে সংসার পেতে ঘর জামাইয়ে রইল। ছি ! ছি !—ছোট মেয়েটার বয়স মাত্র দু বছর আর ছেলেটা মাত্র আট মাসের।

মায়া চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—দাদা, তোমাকে জোড় হাত করে বলছি, তুমি চুপ কর।

সিধু বলল—দেখ মায়া, তোর ঐ নাকে কান্না রাখতো !

আবার খরা আসবে, ঝড় বাদলে কোথায় পড়ে থাকবি, কে দেখবে ? জানবি, এবার মরে পড়ে থাকলেও দেখার লোক নাই। অসুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে, কে কাঁধে করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে ?

মায়া হু, হু করে কাঁদতে কাঁদতে জগনুর কাছে সরে এল।

জগনু বলল—চুপ কর মা, সবই আমার কপালের দোষ।

সিধু বলল—কে বলল, তোমার দোষ ? এবার যে ওকে গিলতে এসেছ !

জগু মায়াকে চুপ করার জন্য কাপড় ধরে টানতে গেল।

সিধু বলল—শোন মায়া, তুই যদি অমন বিনয়-এর অভিনয় করবি, তবে আর এই সিধু মালিককে পাবি নি। শালা, যত সব এক একটা উটকো ঝামেলা। তারপর বলল—তুমি আমার মামা। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব ? তুমি মদের ভাটি বসিয়ে শুঁড়িকে হার মানাও। আমি পাড়ার মাথা, আমার উঁচু মাথা, নীচু করো নি ?

কিন্তু যমুনা ছেলের দিকে তেড়ে গিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভাল কথা। এই না হলে, মামা ভাগনায় তরজা গাওয়া !···শোন সিধু, তোর আর মামার দরকার না হতে পারে, এখন যে তুই সংসারী।

সিধু হাত নেড়ে বলল—অমন মামা জানলে, বিয়ের সময় পাতানো মামা নিয়ে যেতুম।

কিন্তু যমুনা বলল—শোন, যতই সে অন্যায় করুক, ছেলেমেয়েগুলো চোখে দেখে, বাবা না বলে থাকে কেমন করে !—বলেই মায়ার দিকে তাকাল।

মায়াও ডুগরে কেঁদে উঠল—পিসী !

যমুনাও ঘাড় নাড়তে নাড়তে সায় দেবার ছলে বলে উঠল—হ্যাঁ মা একেই বলে রক্তের টান। তারপর বলল—আর শোন, আর কারও দরকার হোক আর না হোক, ও আমার একটি দাদা। ওকে কিছু বলার অর্থ আমারই পিণ্ডি দেওয়া।

সামনেই সিধুর স্ত্রী উমা দাঁড়িয়েছিল। সে অবাক হয়ে বলে উঠল—মা তুমি এমন কথা বলতে পারলে ?

সিধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলল—বেশ, তবে যে যার সে তার বুঝে নিও। কাঁচা গুয়ে ঢিল মেরে আমার লাভ কি ! আমারও নাক আছে।

এতো গেল মায়ার সংসারে ইঁদুরের ইতিহাস। দাপাদাপি করলে সরে পালায়, কিন্তু এবার উই লাগল। একে হটানো খুবই কষ্ট—পাতাল ফোঁড় গর্ত।

মাণিকের সিনেমার নেশা। জলে ভিজে ভিজে সিনেমা দেখে ফিরল। রাতে সর্দি জ্বর হোল, চিকিৎসা অবহেলায় হয়ে দাঁড়াল টাইফয়েড।

হাঁড়ি চলে না, নমিতা ধার করে ডাক্তারের দেনা ও রুগীর পথ্যের ব্যবস্থা করল। কিন্তু কত ধার করে সে! মাণিক বিছানা ছেড়ে চলাফেরা করছে, কিন্তু কারও কাজে এখনও লাগেনি।

মায়া এসে দেখে যায়। ডাক্তার এলে ঘরে এসে দাঁড়ায়, পথে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার শেষ দিন বলল—বুঝলি মায়া, যত সব গণ্ডমুর্খের দল। আগে কল দে, কতকগুলো টাকা বেঁচে যায়, আর নিজেও যানে বাঁচ। কিন্তু সেই টাকার শ্রাদ্ধ হোল—মানুষটাও কিছুদিনের জন্য অকেজো হয়ে গেল,—চলবে কি করে?

মায়া বলল—আপনার দেনা?

ডাক্তার সেন বলল—জানিস, মেয়েটা বেশ হিসেবী, দিনের দিন টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। ভাবলুম, তোকে ধরেই টানাটানি করবে।

মায়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

নমিতা ডাক্তারের সঙ্গে মায়ার কথাগুলো চুপি চুপি নিজের কানে শুনেছিল। সেইজন্য মায়া ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বলল—যে বাবা নিজের সংসার ত্যাগ করে আবার বিয়ে করে; ছেলেমেয়ে নিয়ে নুতন সংসার পাতে, সে যদি এত আপন হয়, তবে নিজের ভাইতো কিছু দোষ করেনি। না হয় সে পৃথক হয়ে খাচ্ছে।—তাও নিজে পৃথক হয়নি—তাকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। দিদিরই স্বার্থের জন্য। আজ আমিও স্বার্থের জন্য বলছি, সংসার চলেনি আমাদের দেখতে হবে।

মাণিক বসেছিল, বলল—হ্যাঁ তুই আঁচল পেতে বসে থাক, চাল, ডাল, তেল, নুন দিয়ে যাচ্ছে এই যে!

নমিতা বলল—শুনিয়ে দিলুম, একই ঘরের ঘর। আমরা উপোষ দিলেও, ছেলেটাত উপোষে থাকুক বলতে পারিনি। তারপর বলল—দেখি এবেলা, ওবেলা বাটি হাতে পাঠিয়ে দেব। দেখি না দিয়ে, কি করে মুখে হাত ওঠে।

মাণিক দাবড়ি দিয়ে বলল—এই, তুই চুপ করতো! অত গজগজানি কানে সহ্য হয়নি।

নমিতা বলল—তবে উপোষ দিয়ে বসে আছে কেন? আবার যদি ঘুরে পড়! ও সব কোন কথা শুনতে চাইনি,—

একই ঘরে, একজন খাবে আর একজন দেখবে, সে হবে নি! কেন তার অসময়ে দেখেনি?

মাণিক উঠে চলে গেল।

মায়া সেরে করে এক সের চাল, আলু, কলাই ধরে দিয়ে বলল—কে জানে তোদের হাঁড়ি চড়ে নি। দেখছি দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস। তোদের খোঁজ নিই, না নিই ডাক্তার কাকাকে জিজ্ঞেসা করে দেখিস।

নমিতা বলল—আমি অত কাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি এই যে। তবে বলছি তুমি যেমন এক সের চাল মেপে দিচ্ছ, খাতায় তুলে রেখো, আমাদের দেবার সামর্থ হলে, ঠিক মিটিয়ে দেব।

ছায়া চেঁচিয়ে উঠল—কত এক সের চাল ধার নিয়েছ তুমি বউদি। কইত ভুলেও বলোনি, দিতে হবে। তুমি আজ কাল যে জোর যার মুলুক তার আরম্ভ করেছ? দিদিকে লুকিয়ে আমি তোমাকে দিয়েছি তিন সের চাল, মনে আছে?—তেলতো কতদিন! কতদিন। তারপর লণ্ঠনটা কতদিন এগিয়ে দিয়েছ বলত? আমাদের লণ্ঠন হ্যারি কিনে তেল ভরতে ভরতে তোমার লণ্ঠনটায়ও কেরোসিন তেল ভরে দিই নি? রেশন তুলতে বের হয়েছি, তুমি কার্ড, গামছা, কেরোসিন তেলের বোতল এগিয়ে দিয়ে বলেছ—ঠাকুর ঝি, মাল তুলে আনো। তোমার দাদা কাজ ছেড়ে এলে মিটিয়ে দেব, কই কোনদিন মিটিয়েছ?

মায়া বলল—হুঁ খুব দাতা।······

ছায়া আবার আরম্ভ করল—দিদি আমাকে ভাল নারকেল তেল কিনে আনতে বলে, আমি ও-গুলো পুরণ করার জন্য, পচা নারকেল তেল কিনে এনেছি। দোষী সেজেছে তিনে মুদি। দিদি তোমারই সামনে গালাগাল করেছে। দিঘী দেখতে যাব বলে পয়সা নিয়েও সব পুরণ করেছি মনে আছে।

নমিতা বলল—তোমরা দিয়েছ বলেইত খোঁটায় পোঁটা বের করে দিচ্ছ।

ছায়া মায়াকে বলল—দিদি, সিধুদাকে বলিস, এবার তার হাতের নিশানটা যেন নমি বউদিকে দেয়। আমরাত জোড়-হাত হচ্ছি, দেখে সবাই নমস্কার ঠুকবে—ওঃ, একেবারে জ্যান্ত যম!···

মায়া চেঁচিয়ে উঠল, এই ছায়া, তুই চুপ কর। এক ঘরের ঝগড়া দশ ঘর মিলে করবি। শোন, তোরা যেমন খাচ্ছিস, ওদের দরকার পড়লে ওরাও খাবে। কাকে কি বলব, বড় বোন আমি, আমাকে ওদের খাওয়াবার কথা। কিন্তু দেখি না ওদের খাওয়াতে পারি কিনা!

॥ সতেরো ॥

অন্য জাতীর কথা জানা নাই, তবে এই দাম করার দিনেও অমায়িক বাঙালীর ঘরের, গরীব সুন্দরী না হলেও মেয়ের বিয়ে সুষ্ঠ ও সংগত-ভাবে সৎ পাত্রের সঙ্গে হয়েছে, এই নমুনা অশো-দিশো।

মায়ার বড় চিন্তা ছিল, ছায়ার বিয়ে নিয়ে। তার টাকা ছাড়া আর কোন পুঁজি নাই। কারণ বংশের পুঁজি তার বাবা খরচ করে বসে আছে। এখন আছে মায়ার নিজস্ব পুঁজি।

বর জুটে গেল। মায়া কোন রকম দ্বিধা না করে সামান্য কিছু বরপন দিয়ে ছায়ার বিয়ে দিল। মায়ার মাথা থেকে আর একটা বড় বোঝা নামল।

দিন কাটে, পরের মাস আসে। বছর ঘোরে। এইভাবে সময় চলে যায়। বিয়ের দু-মাস শ্বশুর ঘরে কাটিয়ে ছায়া এখন দিদির ওখানেই আছে হঠাৎ মায়ার কানে এল। সেজ জামাই রঞ্জন আবার একটা বিয়ে করবে, এবং বিয়ের দিন আজই।

মায়া সঙ্গে সঙ্গে সিধুকে ডেকে পাঠাল। সিধু শুনেই ছুটল কণে-কর্তার কাছে। কিন্তু কনেকর্তা, মেয়ের জ্যাঠামশাই ত্রিলোচন মালিক মোচ পাকাতে পাকাতে বলল—ছোকরা, আমরা আগে শুনলে এর একটা কিছু বিহিত ব্যবস্থা করতুম। আর মাত্র ঘণ্টা তিনেক পর বিয়ে,—আমাদের আয়োজনপত্র, তারপর মেয়ের গায়ে হলুদ পড়ে গেছে তাতো হবে না। তারপর নীচের দিকে চোখ করে, গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলল-হুঁ-উঁ হুঁ। এবার সিধুর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কিভাবে খবর পেলে? কারণ এখন আর এক জনকে ত্যাগ করলুম বলে সিঁদুর আনার প্রথা কে মানঝে? ভাইরে, বাপ-ঠাকুরদারা কি এমনি যার যেমন তার তেমন করে গিয়েছিল।

সিধু বলল—কি করে জানাব, যে রঞ্জনকুমার কড়া থেকে একেবারে বর্ণশ্রেষ্ঠ শিরোমণি হয়ে গেছে।

ত্রিলোচন কটাক্ষ করে বলল—হুঁ, এমনি আর সব জাত তুলে ছোট হতে চায়নি। সত্যইতো কারও গায়ে লেখা থাকে?

সিধু বলল—তিতো কমাতে হলে মিষ্টির দরকার। কিন্তু মিষ্টি কই?—তারপর বলল, জানেন বিপদে নাস্তিকও ভগবান জপে। বলেই

সিধু চলে এলো।

সিধু এককালে ছোট খাটো আপদ-বিপদ নিজের দ্বারা সমাধান করতে না পারলে, গোদাই মল্লিকের শরণাপন্ন হতো। এইভাবে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে করতে সে এখন একজন পাকা হিসেবী মানুষ। তাই সে মায়াকে নিয়ে এল থানায়। সকলের মুখচেনা সিধু। সেই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কি করা যায় তার জন্য দারোগার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে গেল, পিছনে মায়া।

দারোগা সিধুকে দেখে বললেন কি সিধু যে?

সিধু বলল—হ্যাঁ স্যার, আগে আমার খোঁজে যেতেন। আর আজ আমি আপনারই শরনাপন্ন হয়েছি।

দারোগা প্রতুল রায় বললেন—হ্যাঁ সিধু, তোমার দেখছি অনেক উন্নতি!—বামুন না হতে পার কিন্তু টিকি নাড়া ভাষা কিছু রপ্ত করে ফেলছ দেখছি।

সিধু বলল—হ্যাঁ, চৈতন থাকলে কি রেহাই পেতুম স্যার, কোথায় ধরতেন? চৈতনে গিয়েই হাত পড়ত।

প্রতুল বললেন—না, এখন দেখছি কোঁছা গুঁজে কাপড় পরেছ। পাঞ্জাবী চড়িয়ে মনে হচ্ছে তোমরাই সব ধর পাপড় আরম্ভ করবে।

পাশের পাহারারত বন্দুকধারী পুলিশটি বলল—আর কেন বলেন স্যার, উকিলরা আক্ষেপ করছে। এখন নাকি খাস জনতার আদালত। আমরা উকিল আর জর্জ ঐ-যে ওরা বলে সিধুকে দেখাল। কিন্তু পিছনে মায়াকে দেখে প্রতুল বললেন যাক ইনি কি তোমার সঙ্গেই এসেছে?

সিধু বলল—হ্যাঁ স্যার ছা-পোষা মানুষ, আমারই মামাতো বোন। বাবা থেকেও নাই। আবার দ্বিতীয় সংসার পেতেছে। আর ও এখন ভাই-বোনদের নিয়ে ব্যাচারী খাঁটি সংসারি। দুঃখ কষ্ট করে···দারোগা—চশমাটা নাকে নামিয়ে বললেন—আচ্ছা তোমার মামাই তাহলে সোনায় সোহাগা না হয়ে খাদ হয়ে বসে আছে। বুঝলে সবই ট্র্যাডিশন। তবে ব্যাতিক্রম অতীতে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

সিধু তাকিয়ে রইল।

প্রতুল রায় আরও বললেন—দুঃখের বিষয়, এখন সবাই ঘর না চিনে বাহিরটা আগে চিনছে। যাক, কথায় কথায় অনেক কথায় গড়িয়ে গেল। —বলছি বোন, তোমার কি কথা?—বলে মায়ার দিকে তাকালেন।

মায়া বলল—চাঁদপুরে সেজ বোনের বিয়ে দিয়েছিলুম। মাত্র দু-মাস

আগে। কিন্তু আজ শুনছি, জামাই আবার একটা বিয়ে করবে আজই সেই বিয়ের দিন, তাই ……।

সঙ্গে সঙ্গে দারোগা বললেন—আরও একটা কেন, তার পরও সে বিয়ে করতে পারে। তবে সবকটাকে প্রতিপালন করতে হবে। তার বিয়ে পণ্ড করার হাত আমাদের নাই। বলত বোন, এটা তাদের না হয়ে যদি তোমার বোনের বিয়ে হোত ? না, না, বিয়ে পণ্ড করার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সিধু ও মায়া ফিরে এল। সন্ধ্যায় শাঁখ চারদিকে বাজছে, মায়ার মনে এল, এই রকম জোড়া জোড়া শাঁখ তার ঘরে সেদিন বেজেছিল। আজ আবার অন্যঘরে বাজবে। রঞ্জন এত ছোট, মায়ার জানা ছিলনা। সিধুর পিছনে পিছনে ক্রমশ ঘরের দিকে আসছিল। কিন্তু দুঃখের ভারে তার পা যেন উঠছিল না। বোনের কাছে সে কি করে মুখ তুলবে। স্বামীর সোহাগের স্বপ্ন আসতে না আসতেই শেষ। তাদের বিবাহিত জীবনের আগমনী সুরের লহরীর মাঝ থেকেই যেন বিসর্জনের সুর বাজিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধৈর্য ধরল।—কে সে ? কেন সে বাজাল সারা শরীর কেঁপে উঠল। শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ যেমন হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে। মায়াও আজ তাই। হতভাগিনী ছায়ার চিন্তায় সে যেন অচিন্ত্যনীয় এক মুহূর্তে হাজির হোল। কিন্তু তার জবাব কোথায় ? এগিয়ে এসে ভিটেয় পা দিল। দেখল উঠানের ফাঁকা জায়গায় সমস্ত ছেলেমেয়ে তখনও তাদের খেলা ছাড়েনি। ভাবল, দেয় এক দাবড়ি। কিন্তু তাদের খেলা দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল !

চারটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করে একবার পিছিয়ে আসছে পরক্ষণেই এগিয়ে চলেছে। মুখে একই কথা।

আণ্ডুল বাণ্ডুল শৈ…ল।

মনের কথা ক…ই…ল।

ঠিক তাদের দিকে মুখ করে, তাদের চেয়ে একটি বয়সে বড় ছেলে তাদের সঙ্গে ক্রমশ এগিয়ে পিছিয়ে হাত নেড়ে কাছে কাছে ডাকছে। মনে হোল—কি এক চিরন্তন সত্যের সন্ধ্যানে তারাও গান করছে। আর তাকে বরণ করে নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে—

আণ্ডুল বাণ্ডুল শৈ…ল।

মনের কথা ক…ই…ল।

মায়া কিছু না বলে তাদের খেলা দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কালু হঠাৎ দিদিকে খেলা ছেড়ে তাকে জড়িয়ে

ধরল। বুস খেলা শেষ। মায়ারও দিশে হলো—তার মনে নূতন ভাবে উদয় হোল—একি খেলা ? ধীরে ধীরে ভাইকে নিয়ে সে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

॥ আঠারো ॥

অভাগা যে দিকে চায়, সাগরও শুকায়ে যায়।''—রায় কর্তার মায়াকে উদ্দেশ্য করে সেদিনকার বলা কথা আজ আবার মনে এল। একটু আগে সকলে মিলে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, যে তারা ছায়ার খোরাক-পোষাকের জন্য রঞ্জনের বিরুদ্ধে কোর্টে উঠবে। কিন্তু সবাই সায় দিলেও মায়া অন্তর থেকে সায় দিতে পারে নি।

ভগবানের এটা একটা পরীক্ষা কিনা, মায়া ভেবে পেল না। কারণ সে যত শক্ত হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, পরমুহূর্তে আরও শক্ত পরীক্ষা এসে হাজির হয়। সারাজীবনই তাকে পরীক্ষা দিতে হবে কিনা সে ভেবে পেল না।

বহুদিন আগে এক সাধু তাকে বলেছিল, মা তুই যত নির্ভিক শক্ত হবি, ততো তুই ফল লাভ করবি। কিন্তু কিসে ফল লাভ ?

তবে কি সবার মত তার জীবনে বিধাতা পুরুষ সুখ লেখেন না। ভাগ্য বলে যে দ্বাত্ত্বিক মতবাদ, সেটা তার জীবনে নাই ?

কিন্তু সে মুহূর্তের মধ্যে, নিজেই উত্তর খুঁজে পেয়েছিল,—ভাগ্য, যার কাছে যাইহোক, তার কাছে কোন কিছু উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দীপনা। —যাদের মধ্যে ঐ উদ্দীপনা নাই, তারাই মানে ভাগ্য।

মায়া একমুহূর্ত স্থির হোল, পরমুহূর্তে চিন্তায় পড়ল। অস্তিত্ব রক্ষার যে দ্বন্দ্ব তা যদি শুধু নিজের জন্য কেউ ভেবে থাকে, তবে সে নিজের কর্তব্যের দিকগুলি দেখতে পায় না। এখানেই মান, অপমান ও আত্মিক সম্বন্ধর প্রশ্ন এসে হাজির হয়। যারা মান বোঝে না, তারা অপমানও চেনে না। আবার যারা এই নিয়ে ভাণ করে তারাই ভণ্ড। তারা জীবনে এক দিকে গতি নিয়ে হাঁটে, যে হাঁটার শেষ নাই সেখানে, শান্তিও নাই।

ওষধি মূল থেকে ফল, তারপর যখন সে শুকিয়ে খড় হয়ে যায়, তখন সে এক চিন্তা নিয়ে মরে। আমি সকলের মধ্যেও বিলীন হয়ে

রইলুম আমার আত্মার অস্তিত্বত বটেই, বরং আরও নিজেকে বাড়িয়ে নিলুম। কিন্তু মানুষ ভাবে, শুধু আমি তাই নিজের চিন্তা ছাড়া অপরের চিন্তা তার কাছে আপেক্ষিক। যারা সকল মানুষের চিন্তা করে, তাদের মধ্যে কোন সংশয় থাকে না। সকল পরিবেশে নিজের সঙ্গে সবাইকে বাঁচায়। তারাই আমাদের মধ্যে মহামানব বলে খ্যাত ও শান্তির প্রতীক হয়ে থাকেন। কিন্তু শান্তি যেখানে অশান্তি এনে দেয় সেখানে সে কি করবে!

রাত তখন দশটা। আগামী কাল কোর্টে যাবার চিন্তায় সে চিন্তিত। একা একা ভাবতে ভাবতে সে অস্হির হয়ে উঠল। শেয়ালের শব্দ শেষ। হঠাৎ কানে এল – কিরে মায়া, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

মায়া প্রথমে সাড়া দিল, কে ?

গোদাই মল্লিক সাড়া দিল—আমি তোর মল্লিক কাকা।

মায়া ধড়পড় করে বসে বলল—না কাকু ঘুম আসে নি, তুমি দুয়ারে উঠে এসো।

গোদাই বলল—ঘুম আসার কথা নয়, তবুও ঘুমাতেই হবে, নইলে বাঁচবি কেমন করে। জানিস ঘুমের ঔষধ আছে ?

মায়া বলল – এ যে রোগের জন্য নয় চিন্তার জন্য কাকু।

গোদাই বলল – তারও জন্যে ঔষধ আছে। শোন মা, যা দিয়ে মানুষের অসুখ কমে, সুখ আসে, তাইতো ঔষধ। তাতে সে ফোঁটা কাটা গঙ্গাজল হোক, আর বড়ি-বটকাই হোক, আর জলপোড়াই হোক। যাক, জানিস কিন্তু মানুষের সৎ উপদেশও একরকম ঔষধ ?

মায়া বলল—না জানলেও, তোমার কাছে থেকে জেনে শিক্ষা হোল।

গদাই বলল—তবে শোন, তোর ঔষধ তোর ঘরে।

মায়া বলল—কি কাকু, কিছু বুঝতে পারছিনা।

গদাই বলল—আমি তোর ঔষধ। আমি তোর ঘরে না বাইরে ?

মায়া চুপ করে রইল।

গোদাই বলল—পালাধুরীকি বউকে জানবি, কি কোর্টে উঠে খোরাক পোষাকের দাবীকে জানবি ? আজ সে দেবে, আগামীকাল বন্ধ করে দেবে। আবার কোর্টে গিয়ে উঠবি, পরশু দেবে, তারপর পুনঃমুষিক ভবঃ। সুতরাং সময় নষ্ট। হ্যাঁ, উপকার হবে সরকারের, আর উকিলদের পেট ভরবে। তাই ভেবে দেখ, খরচ করেও শান্তি নাই।

মায়া বলল—আমিও তাই ভেবেছি, কিন্তু…

সঙ্গে সঙ্গে সিধু এসে বলল—মানুষটার শাস্তি ?

গোদাই বলল—সিধু, মৌমাছি দেখেছিস, সে-ই মধু এনে চাক ভরে, কিন্তু যখন সংগৃহীত মধু পায়, এমন খায়, যে সেই মধুতেই পড়ে হাবু-ডুবু খায়। তাই কি হয় দেখ, শুনে রাখ, সময়ে সব হয়, তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

এই ঘটনার তিনমাস পর রঞ্জন এসে হাজির হোল।

ছায়া তখন মায়ার ছায়ায় ছায়ায়। সিধু লক্ষ্য করল এবং বেশ বুঝতে পারল বর্তমান পরিস্থিতিতে, মায়া রঞ্জনকে বলতে দ্বিধা করবে, একমেয়ে ছেলে হয়ে স্নেহের নিবীড় বন্ধনে তারপক্ষে রঞ্জনকে বলাও শক্ত। তাই সিধু গিয়ে বলল—কি ব্যাপার! এখানে আবার কি মনে করে ?

রঞ্জন সিধুর চোখ মুখের ভাব দেখে ধরেছিল, গতিক বড় গোলমাল!

সে মুখ না তুলে বলল—আসা হয়নি, তাই চলে এলুম।

সিধু বলল—কোথায় এলে ?

রঞ্জন একরকম কোঁত পেড়ে বলল—আমি ছায়াকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মায়া বলল—তাই নাকি ? এত দিনে ঘরের কথা বাইরে মনে পড়ল ? বাহিরেই কাটাও বুঝি ?

সিধু রেগে গিয়ে বলল—আচ্ছা, ও লম্পটটাকে জ্ঞান দিলেই নেবে কেন ? জ্ঞান-ই কি জিনিষ ও জানে ? তারপর রঞ্জনের দিকে দৃষ্টি করে বলল—আবার যে একটা বিয়ে করেছ, খেয়াল আছে ?

রঞ্জন বলল—তাতে কি আছে। আমি কি বলেছি, তার জন্য ছায়াকে নিয়ে যাব না ?

মায়া বলল—আমরা জানি, পাশাপাশি হাঁড়ি থাকলে ঠোকাঠুকি হয়। কোনটা ভাঙবে, কোনটা ফাটবে, তার কি ঠিক আছে ?

এবার রঞ্জনের জামাই মেজাজ! বলল—বটে!

মায়া বলল—মানুষের গায়ে ছোট বলে লেখা থাকে না। কিংবা ছোট বড় বলে নক্‌শা কাটা থাকে না। তাদের আচার, ব্যবহারেই তা প্রমাণ হয়। তোমরা এখনও ছোট, কারণ মন থেকে, ছোট নিচু ভাবটা মুছতে পারনি। কিন্তু আমরা মুছে ফেলে সমাজ বলে বেছে নিয়েছি। হ্যাঁ কলির কুলিন, দশ জায়গায় দশটা, বউ পুষে রাখব একদিন করে তার হাতে খেয়ে ধন্য হব। শোন আর এ রাস্তায় হেঁটোনি বলে দিলুম আমার বোনের খেটে খাবার গতর আছে—সে কারও উপর ভরসা করেনি।

তারপর বলল, এই দেখ, দু'বোনে খাটতে গিয়েছিলুম, গা-কাপড় ধুয়ে সে রান্না বসিয়েছে, আমি তোমার সঙ্গে বচসা করছি।

রঞ্জন বলল—দিদি!

সিধু রঞ্জনকে বলল—দিদি নয়, বল রাক্ষসী। যাও মানে মানে কেটে পড়। আর শোন, দোকানে শাঁখা সিঁদুরের অভাব নাই। পারতো…দুঃখ নাই। কিন্তু এদিকে পা বাড়ালেই পাঁঠাবলি।

॥ উনিশ ॥

ভাগ্যের পরিহাস!—কুমুদের বাবার ভিটেয় বাস করার ভাগ্য কপালে জোটেনি। ছোট ভাই কমল বাবার মরার আগেই, দাদাকে ফাঁকি দিয়ে বাবার কাছ থেকে সমস্ত জমিজমা লিখে নিয়েছিল।

কুমুদ বড় মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু তার বড় একটা অসুবিধা হয়নি। কারণ সে বউ, ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে উঠল শ্বশুরের ভিটেয়। যেখানে শ্বশুরের দৌলতে কিছু জমি-জমাও করে নিয়েছিল। কুমুদের দু'-ছেলে। ছেলেরা স্কুল যায়। বড় ছেলে চার ক্লাসের ছাত্র।

বাঙালীর পৌরাণিক, সামাজিক, লৌকিক ও তাত্বিক ইতিবৃত্তিকা নিয়েই এদের বারোমাসের তের পার্বণ। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পড়লতো, ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠে তিল থেকে তাল। লেখক, কবি, সাহিত্যিক তাকে যুগের তালে ফেনায়। ভূগোল স্থান নির্দেশ করে, দর্শন বিশ্বাস আনে ও ইতিহাস প্রচার করে—লিপিবদ্ধ করে সুদীর্ঘ লিপি। বাস্তবে পরিণত হয়। বোষ্টম গান বেঁধে ভিখ আদায় করে, ঠাকুর মা নাতী নাতনীদের বিছানায় ঘুম পাড়ায়। তাত্বিক ধর্ম ভীরু মানুষের কাছে বলে নাম কিনে, পেট কাপড়ের যোগাড় করে।

আর ক'দিন বাদেই আম বারুণী। "দীঘি" জমজমাট মেলা! দেখবার মত। কত লোক জন। মায়া বসে বসে ভাবছিলো দীঘির কথা। কতদিন সে দীঘি দেখতে যায়নি। এ বছর যাবে, আম দিয়ে দীঘির জলে স্নান করবে। ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখবে।' ভাবতে ভাবতে মায়া অতীতে রঞ্জিত রায়ের কালে পেঁাছে যায়।…গালে হাত দিয়ে সে ভাবতে বসল।

গড়বাড়ীর প্রবল প্রতাপশালী প্রজা বৎসল জমিদার রঞ্জিত রায় ছিলেন দশভূজার বিরাট ভক্ত। তাঁর উপর দশভূজা সন্তুষ্ট হয়ে কন্যারূপে তাঁর

ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। মেয়ের দিকে বাবার নজর ছিল অতি গভীর এবং খুবই আদরের সঙ্গে একমাত্র মেয়েকে বড় করছিলেন। রূপেগুণে মেয়ে ছিল যেন সাক্ষাৎ দুর্গা।

মানুষের ঘরে, মানুষ হয়ে দেবী দেখা দেয়, মানুষ জানত না! কিন্তু পুরাণ, ইতিহাস কিংবা ঐ রকম ইতিহাসের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।

পুরাণ, ইতিহাস এই ইতিহাস অনেকবার দেখিয়েছে। স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বার্থের নেশায় সব ভুলে গেছে। দেবতাকে ডেকে তাকে মানুষের পটভূমিকায়—মানুষরূপেই দেখেছে। তার আসল ভাবমূর্তিটুকু উপলব্ধি করার সুযোগ করে নেয়নি কিংবা সময় করে নেয়নি।

মেয়ে বড় হয়। রঞ্জিত রায়ও মেয়ের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের যা-যা দরকার, রঞ্জিত রায় নিজ হাতেই করতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইংরাজ তখন আমাদের দেশের শাসক। জাহাজে ঘুরে বেড়াত। মেয়ে রূপে মানুষ মতোহারা হয়ে যেত! মানুষ রূপ কি জিনিষ বোধ হয় তখনই উপলব্ধি করত। কিন্তু তখন ছিল, আজ্ঞা, ন্যায়, অন্যায় মানার সময়। কিন্তু ইংরাজরা ছিল বড় কামুক। তাদের কামের ইতিহাস বর্তমান আমাদের দেশের সিফিলিস ও গণোরিয়ার বংশপরমপর, বেশ্যালয়ে কামের ভূত-প্রেত। কিংবদন্তি যে রঞ্জিতরায়ের মেয়ে যখন চুল এলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ইংরেজ পুরুষরা মোহিত হয় জাহাজের মাঝ থেকে তীব্র সিটি মেরেছিল। তাতে মেয়ের ক্রোধদৃষ্টিতে জাহাজডুবি হয়েছিল এবং কথিত আছে, নাকি, জায়গাটা বালিতে ভরে গিয়েছিল।

মেয়ে বড় হয় বাবাও সর্তক।

পৌর আরামবাগ, বিশেষ করে পূর্ব দক্ষিণ কোন যেখানে দ্বারকনদ। আরামবাগকে শ্যামবাটী থেকে ভাগ করে রেখেছে। উত্তর হতে দক্ষিণে পারুল, বাসুদেবপুর, বৃন্দাবন পুর এবং বিক্রমপুর, এই চত্তর জুড়ে দেবতাদের মাহাত্ম্য। আরও পূর্বদিকে এগিয়ে বিরাট এক দীঘি। রঞ্জিত রায় তাঁর বাসস্হান গড়বাড়ী, যার ভগ্নাবশেষ আরামবাগ তারকেশ্বর বাস রাস্তার পাশে তিনি সোজা দক্ষিণে এসে এক বিরাট দীঘি খনন করেন। যার ভৌগোলিক অবস্হান দীঘি নামেই প্রচলিত।

বর্তমান দীঘির পূর্ব ও দক্ষিণ পাড় ছিন্নভিন্ন। কিন্তু আশ্চর্য, কিভাবে ঐ দীঘি খনন করেছিলেন এবং কারা খনন করেছিল! আজ আমরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির কাছে আর তত পদানত নই। বরং কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করে চলেছি। আজকের দিনে ঐ দীঘি

খনন করা কোন ব্যাপার নয়।. কিন্তু তখনকার দিনে ভাববার বিষয় ছিল।

জনমুখর যে অসুররা নাকি একরাতে ঐ দীঘি খনন করেছিল এবং সেই দীঘি খনন করার পর তারা ঐ স্থান থেকে আরও পশ্চিমদিকে একটা মাঠ পার হয়ে এসে মোবারক পুরে ঝোড়া ঝেড়েছিল। সেখানে ঝোড়া ঝাড়া মাটিতে একটা ঢিপি হয়েছিল। আজও আরামবাগ বন্দর বাস রাস্তার উপর বিখ্যাত গির্জাতলা চত্তর। আবার অভিরাম গোস্বামীর মাহাত্ম্যও জনমুখে প্রচারিত। যে ঐ দীঘির মধ্যে যে কাঠের জাঠ আছে, তাকে দীঘিতে এনে প্রতিষ্ঠা করা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অভিরাম গোস্বামী নাকি একাই জাঠটা ঠেলতে ঠেলতে দীঘিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কলষিত মন, আমরা না পারি দেবতা বলে বুঝতে বা ডাকতে। বিজ্ঞান বলে তাকেই সেই জায়গা পূরণ করে নিয়েছি।

এখন বাসুদেবপুর—মনসাতলার মোড় ধরে সোজা পূর্বদিকে পা বাড়িয়ে গেলে দেবতাদের মাহাত্ম্য আমাদের চোখে পড়ে! মনে শিহরণ জাগে। নূতনের মাহাত্ম্য আমরা ধন্য হই। বিশালাক্ষী মন্দির ইতিহাস বলে ৫২ টুকরো সতীর নাকি কোড়ে আঙ্গুলটি এখানে পড়েছিল। ভয়ে নামান্তকর।

কত যোগী পঞ্চমুণ্ডির আসনে সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। এ পড়ে ইতিহাস কতদিনের, কত কালের।

কথিত আছে, রাখাল ছেলেরা নাকি গরু ছেড়ে মায়ের কাছে পাঁঠা-বলি খেলেছিল। মা-নাকি খাঁড়া হাতে মন্দির থেকে বের হয়ে এসেছিল। এখনও দিন দুপুরে মন্দিরের দিকে তাকাতে গা ছম্ ছম্ করে উঠে।

আরও এগিয়ে বিক্রমপুর কালীমন্দির। মনে হয় মন্দিরটি যেন জলের উপর ভেসে রয়েছে। শ্বশানের উপর ইঁহার মহিমা মানুষের মনে পূজার অর্ঘ্য। তাই অস্তিকরা অসুরে দীঘি খনন করার ইতিহাস মানে এবং ঐ থেকে রঞ্জিত রায়ের ইতিহাস আজও জ্বাজল্যমান।

কিংবদন্তী যে—দশভূজা রঞ্জিত রায়ের কন্যারূপে জন্ম নেবার আগে স্বপ্নাদেশ হয়েছিল—তোর ভক্তি ভরে আমাকে ডাকার জন্য, সন্তুষ্ট হয়ে তোর ঘরে অধিষ্ঠান করেছি। কিন্তু যেদিন তুই বিরক্ত হয়ে আমাকে চলে যেতে বলবি সে দিনই আমি চলে যাব।

প্রজাবৎসল্য রঞ্জিত রায় যখন প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে

শুনতে হাঁপিয়ে উঠতেন ঠিক সেই সময়ই মেয়ে এসে বলত বাবা, আমি যাই—চলনা দীঘি, চল চল, দৈনিকইতো বল আজ নয়, আগামীকাল।

রঞ্জিত রায় প্রজাদের কথা এক কানে শোনে অপর কানে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে শুনতে শুনতে বলেন—ঐ শোন যামিনী দাসীর ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, কান্না-কাটি করছে আমাকে গিয়ে দেখে আসতে হবে। নবীন মালিকের করের দায়ে গরু খুলে এনেছে, হাতে পায়ে ধরছে এখুনি যেতে হবে। গোমস্তার ঘর, সে জ্বরগায়ে আসেনি। পটু করের দিন চলেনি, এখুনি কর মুকুবের কথা বলে তাকে ঘর পাঠাতে হবে। দেখতোরে মা পটুকে কিছু চাল ডাল দিল কি না ?

মেয়ে এসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল—হ্যাঁ দিয়েছে।

রঞ্জিত রায় বলেন—মল্লিক পাড়ায় মায়ের খেলা হয়েছে ? সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বলল—মায়ের খেলা কি বাবা ?

রঞ্জিত রায় বললেন বসন্তের মা। এখনও নৌকায় করে বিশালক্ষীর পূজা করতে যাব, তারপর চানজল নিয়ে যাব মল্লিক পাড়ায়।

মেয়ে বলল—তুমি-ই নিজে যাবে ?

রঞ্জিত রায় বললেন—মায়ের শুশ্রূষা তো ছেলেরই করতে হয়রে মা।

মেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—না ! আর পেরে উঠলুমনি।

রঞ্জিত রায় বললেন, তবে দেখছিস তো, কত মানুষের দুঃখের কথায় কি আনন্দ করে চান করতে যেতে ভাল লাগে। যা মা, পরে তখন যাব। তার পর প্রজাদের দিকে মুখ ফেরাতে ফেরাতে বললেন তুই-ই বলল না সময়-ই বা কই ?

কিন্তু সেদিন মেয়ে নাছাড়বান্দা—বাবা, তুমি যদি আজ না যাও, তবে আমি এই চললুম।

রঞ্জিত রায় আজ তিতিবিরক্ত। দেবতার মহিমার কাছে তুচ্ছ যে, তিনি একটা মানুষ।

দেবীর ভান কি—কালকেতু ব্যাধ আর ফুল্লরার উপাখ্যানে মনে নাই ?

রঞ্জিত রায় ভুলে গেলেন সেদিনের স্বপ্নাদেশ। রেগে তখন লাল। বললেন জমিদার রঞ্জিত রায়ের মেয়ে, তারপর একা···ও বাবা বলে কি ব্রাহ্মণ আমি, ত্রিসন্ধ্যা গায়েত্রী জপ করি···। তারপর জেদের বসে বলে ফেললেন—যা ! যা !

চৈত্রের আমবারুণী। রঞ্জিত রায়ের একমাত্র মেয়ে চান করতে চলল

দীঘিতে। দীঘির পাড়ের কোনে এল শাঁখারী হাঁকছে শাঁখা চাইগো।

মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকলো—শাঁখারী…

শাঁখারী মেয়ের ডাক শুনে সেখানে হাজির হোল। কিন্তু মেয়েকে দেখেই তার চক্ষুস্থির !

মেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল—দেখছ কি, দাও আমাকে শাঁখা পরিয়ে। আহা কতদিন আমার হাতে শাঁখা নাই দেখছ ? তোমার মত শাঁখারী আসেনি, আমারও আর শাঁখা পরা হয়নি।

শাঁখারী আরও অবাক !—কে এই সুন্দরী মেয়ে ? বিয়ে হয়েছে কোন লক্ষণ-ই নাই। আর বলে তোমার মতো শাঁখারী আসেনিতো, আমার আর শাঁখা পরা হয়নি। শাঁখারীও অভিভূত হয়ে মেয়ের দিকে তাকায় আর মুখ নামায়। তারপর ভাবল, কার হাতে, কিভাবে শাঁখা পরাব। মেয়ে যে নিজেই শাঁখার শাঁখায় মায়ের মূর্তিতে মূর্তিময়ী।

মেয়ে বলল—কি গো শাঁখারী, কি হোল ?—বিশ্বাস করো, তোমাকে দেখেই আমার শাঁখার কথা মনে হোল। আচ্ছা শাঁখারী—আরও কত কত শাঁখারী আমার নজরে এসেছে, কিন্তু আমারতো শাঁখা পরার কথা মনে হয়নি।

যাক পরাও, দেখছ কি ! বলেই মেয়ে নিজেই শাঁখারীর দিকে হাত এগিয়ে দিল।

এবার শাঁখারী কোন উপায় নাই দেখে শুধু থতমত খেতে লাগল,—অনূঢ়া… !

মেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল—কেন তেল মাখা গায়ে তোমার শাঁখা পরালে বুঝি—ব্যবসায় অপয়া হবে ? তারপর বলল—নাগো শাঁখারী, তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে না। দেখ, কেন বলতো আমি এই প্রথম আজই হলুদ মেখেছি বলে সারা গা দেখতে লাগল। তারপর সহানুভূতি ছলে বলল—শোন, তোমার মঙ্গল হবে।

শাঁখারী শোনে আর তাকায়।

মেয়ে—বলল, কি ভাবছ ? নাও পরাও বেলা যে বহে যায় !

শাঁখারী এবার মেয়েটির পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত দেখে নিয়ে, আরও অবাক হয়ে চোখের দিকে তাকাল।

মেয়ে বলল—বেশ এবার হয়েছে তো ?

এবার শাঁখারী চোখ মেলে মেয়ের সমস্ত শরীরটা ভাল করে দেখে নিয়ে, যেই সিঁথিতে নজর এল—বলতে গেল, তুমি যে অনূঢ়া, কিন্তু

বলে ফেলল টাকা ?

মেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল—আমার বাবাকে গিয়ে বলবে, তোমার মেয়ে শাঁখা পরেছে তুমি তার শাঁখার দাম দাও। হ্যাঁ এ-ও বলবে ঠাকুর ঘরে কোলঙ্গায় লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে টাকা রাখা আছে।

শাঁখারী আরও অবাক !

মেয়ে খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল ও বাবা ? তুমি বুঝি আমার বাবাকে চেনোনি ? শোন, যার এই দীঘি, সেই রঞ্জিত রায় আমার বাবা।

শাঁখারী শাঁখা পরাতে শুরু করল। কিন্তু যেই দু-হাত দুটো করে শাঁখা পরায়, পরক্ষণে দুটো হাত এগিয়ে আসে। কিন্তু সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়ে তার আর শাঁখা না পরানোর উপায় নাই। তাই শেষে বলল— আচ্ছা কত শাঁখা আনলুম, কিন্তু—

মেয়ে বলল – ক'টি পরিয়েছ ?

শাঁখারী যোগ বিয়োগ করে বলল—কুড়িটি !

মেয়ে বলল—কত দাম ?

শাঁখারী হিসাব করে বলল—এক টাকা।

ঠিক আছে, একটাকাই তুমি পেয়ে যাবে।

কথা শেষ। মেয়ে স্নান করতে দীঘিতে নামল এবং শাঁখারী রঞ্জিত রায়ের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

শাঁখারী সব গিয়ে রঞ্জিত রায়কে বলল— !

রঞ্জিত রায় শুনেই অবাক। বললেন দূর ! দূর ! কার মেয়ে শাঁখা পরেছে ? আমার মেয়ে কেন শাঁখা পরবে ? এখন তার কেন শাঁখার দরকার ? যাও, কাকে শাঁখা পরিয়ে এখানে এসেছে তাগাদা করতে।

শাঁখারী ভয়েই অস্থির ! তবুও বলল—না, না, আপনার মেয়ে, সে এমন পর্যন্ত বলে দিল, যে বাবাকে বলো পূজার ঘরে কোলঙ্গায় লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে টাকা রাখা আছে।

রঞ্জিত রায় বললেন, যত সব গাঁজাখরি কথা বলার জায়গা পাওনি ! আমি দিন রাত পূজো করি, মা আমার পূজার যোগাড় করে দেয়। ধূপ দীপ জ্বালায় ফুল এনে দেয়। এই তো সকালে পূজো করেছি, আর মা আমার ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি লক্ষ্মীর ঝাঁপি দেখিনি ? ওতে তো আমার আসল মা রয়েছেন।

রঞ্জিত রায় কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কি যে তাঁর

হলো, বোঝা গেল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ দেখি। দাঁড়াও।

পরক্ষণেই উল্লাসে আটখানা হয়ে বললেন ঠিকইতো বটে। এইতো তোমার শাঁখার দাম। তারপর রঞ্জিত রায় আরও যাচাই করার জন্য বললেন আচ্ছা শাঁখারী, তোমার শাঁখার দাম কত ?

শাঁখারী বলল এক টাকা।

রঞ্জিত রায় বললেন ঠিকইতো, কিন্তু তাতে তো···বলেই বললেন আচ্ছা, আর একবার দেখে আসি। দেখে ফিরে এলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর সন্দেহের শেষ নয়।

এদিকে রঞ্জিত রায়ের স্ত্রী তখন মেয়ের খোঁজে পাগলীনির মতো ওকে তাকে এখানে ওখানে খোঁজ করতে পাঠাচ্ছেন। নিজেও খুঁজতে খুঁজতে সারা! রঞ্জিত রায়ও মহা মুস্কিলে পড়ে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বললেন শাঁখা পরেছে! এবার জমিদারী মেজাজ ছেড়ে বললেন চলত কোথায় তুমি শাঁখা পরিয়েছো দেখাবে। মেয়ে আমার কেমন শাঁখা পরেছে ?

রঞ্জিত রায় হন্ত দন্ত হয়ে সোজা দক্ষিণ মুখি রাস্তা ধরে হেঁটে চললেন-পিছনে ভীত শাঁখারী সঙ্গ নিল। দীঘির পাড়ে পেঁছে শাঁখারী রঞ্জিত রায়কে বলল—চলুন, আরও একটু এগিয়ে চলুন আ—রও আ—রও—তারপর নিজে এগিয়ে গিয়ে বলল—এই যে এখানে বসেই আপনার মেয়েকে শাঁখা পরিয়েছি কিন্তু কই ?

রঞ্জিত রায় হাঁকলেন—হ্যাঁরে মা, কোথায় তুই গেলি ? কই কেমন শাঁখা পরেছিস দেখা ?

হঠাৎ মাঝ দীঘিতে জলের ছল ছল শব্দ উঠল। কন্যা রূপা দুর্গা তখন হাত তুলে দশভুজা মূর্তিতে দেখা দিলেন রঞ্জিত রায়কে। রঞ্জিত রায় ও শাঁখারী দেখলেন দশ হাতে কুড়িটি শাঁখা। এতক্ষণে রঞ্জিত রায়ের দশভুজার স্বপ্নদেশ মনে পড়ল। ওঃ হো···হো! তিনি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। মা তুই আমাকে দেখা দিলি, ধরা দিলি নি,—পাপী যে —মন—নাই,—চোখ নাই! তারপর শাঁখারীকে বললেন শাঁখারী তুমিই ধন্য! তুমিই—মাকে শাঁখা পরিয়ে, মায়ের স্পর্শলাভ করেছ,—নাও টাকা।

শাঁখারী বলল—না, আমিও পয়সা নেব না। বলে সেও হঠাৎ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কারণ তিনি যে স্বয়ং শিব বলে কথিত আছে।

বর্ধমান জেলায় ক্ষীরগ্রামে যে যোগাদ্যামারও এই রকম কিংবদন্তী আছে।

জনমুখর যে দীঘি থেকে থালা-বাসন কাজ কর্মের জন্য দেওয়া নেওয়া হোত, কিন্তু অবিচার হত নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এ-ও শোনা যায় যে এক সময় অনাবৃষ্টির দিনে দীঘির মাঝে মন্দিরের চূড়া দেখা গিয়েছিল। এবং অতিবৃষ্টিতে বিরাট এক বন্যার সময় দক্ষিণ পাড় ভেঙে নাকি দীঘি থেকে রথও বের হয়ে গিয়েছিল।

এই পৌরাণিক ঘটনার পর থেকে প্রত্যেক বছর আমবারুণীতে দীঘির মেলা বসে। সাধবারা দীঘিতে স্নান করে শাঁখা সিঁদুর পরলে নাকি শাঁখা সিঁদুরের পরমায়ু বাড়ে। এতক্ষণে মায়ার দিশে হোল হুঁ। তারপর ভাবনা শেষ হোল। দীঘিস্নানে নাকি সকলের পুণ্য হয়।

সামনেই আরামবাগ শহর।

জীবিকা অনুসারে বাঙালী এক এক জায়গায় বসবাস করার জন্য বেছে নিয়েছে। বোধ হয়, বাঁচার তাগিদে। পেশা অনুসারে সমাজে বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে যদিও এই জাতপাতের বিচার উঠতে বসেছে, হ্যাঁ, সেটা যদি মনপ্রাণ দিয়ে হয়, তবেই পরিত্রাণ। কিন্তু উহা কি করে বলা যায়। মনপ্রাণ দিয়ে বাঙালী নিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয়—উহা রুচি অনুসারে ক্রমশ গ্রহণ করছে এবং বেশীর ভাগই ঐ রুচীকে তালিম দেয়, মনে লাগাও অর্থের আমদানী।

যাই হোক, আরামবাগ শহরের দক্ষিণ বরাবর চাকুরী-জীবি ব্রাহ্মণ সামান্য কায়স্থ, গোয়ালা ও তিলি সম্প্রদায়ের বাস। ইহাদের চাষও একটা বড় রকম জীবিকা। আরও দক্ষিণ ঘেঁষে, যেখানে হুগলী মেদিনীপুর জেলার কোলে এসে মিশেছে, ঐ চত্তর জুড়ে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বাস। এদের প্রধান জীবিকা চাষ। তাই বীরেণ শ্যাসমল এদের মহিষ+ষ্ণ-মাহিষ্য বলে নূতন খেতাবের প্রচলন করেন। বর্তমানে ইহাদের বহু শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধিজীবি, আবার অনেকে চাকুরী করে। কিন্তু চাষের সঙ্গে এত অঙ্গা-অঙ্গিক ভাবে আর কোন সম্প্রদায় জড়িত নয়। তাই দক্ষিণ থেকে নারী পুরুষ, ছেলে মেয়ে আসে দীঘির মেলায় জিনিস কেনার জন্য। চাষীরা আসে চাষের লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, দা আর মেয়েরা আসে মাদুর, ঝোড়া চ্যাঙারী, ডালা, ঠেকা চালুনী প্রভৃতি কেনার জন্য। গৃহস্বামী আসে সস্তায় লঙ্কা, হলুদ জিরা প্রভৃতি সারা বছরের দোকান সওদার জন্য। এরপর হাত পাখা নানান খেলনার মেলা এই দীঘি।

তেমনি আরামবাগের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে বামুন,

তিলি, আগুরীর সঙ্গে বাস করে প্রচুর উপজাতী শ্রেণীর মানুষ। তারা সারা বৎসর তাকিয়ে থাকে দীঘির মেলার দিকে। সারা বৎসর ধরে তৈরী করে বেতের, বাঁশের জিনিষপত্র, খেলনা।

কর্মব্যস্ত মানুষ আজ দীঘির পুণ্যের চেয়ে আসে সাংসারিক নিত্য জিনিষ কেনা বেচার জন্য। বাস্তব আজ অবাস্তবকে ছাড়িয়ে যায় না, যেতে পারে না। তখনকারের রীতিনীতিকে বর্তমানের মানুষ হুজুগ বলে মুচকি মুচকি হাসে। ধর্মের নামে তারা নানা গোঁড়ামীরা কথা বলে। কিন্তু বর্তমানের মানুষের কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য করলে আগের ধর্ম বর্তমানে কর্মে এসে হাজির হয়েছে। তখন মানুষের স্বল্পতার জন্য পেট কাপড়ের কথা বর্তমানের চেয়ে কম ভাবনা ছিল। মানুষ ছিল কুঁড়ে। সভ্যতার আলো সকলের মনেও এসে পড়েনি। ভাত কাপড় ছাড়া কিছু চিনতনা। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিক্ষার দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। ফলে, আরও অর্থ চাই। তাই খাটুনি বুদ্ধি বিবেক, পছন্দ, অপছন্দ, রুচী, অরুচীর প্রশ্ন।

উত্তর থেকে মানুষ আসে দীঘির ঠিক দুটো, কি একটা দিন বা আগের রাতের গরুর গাড়ী, টলি করে।

রাত তিনটের পর গরুর গাড়ীর হেডলাইট লণ্ঠন দেখা যায়। মনসা-তলার মোড়ে বাঁক সারার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলেই বোঝা যায় গরুর গাড়ী। একটু আগে থেকে গাড়োয়ানের হ্যাঁট-হৈ শব্দ তারপর অবিশ্রান্ত মানুষের মাথায় মোট নিয়ে গজ্‌গজ্‌ শব্দ প্রতীক্ষিত আমবারুণীর আগমনের কথা জানিয়ে দেয়।

এইবার পর পর লরী বোঝাই মাল এগিয়ে চলে বেচবার জন্য। আর দক্ষিণ থেকে মানুষ আসে খালি হাতে, গাঁট বাঁধা টাকা নিয়ে। তাই বর্তমানে দীঘির পুণ্যের নামে ক'দিনের ব্যবসা কেন্দ্র। আশ্চর্যের কথা, মাদুর বিক্রয়ের জন্য কাঁথি থেকে মানুষ রাশি রাশি মাদুর নিয়ে হাজির হয়। পথের পথিক হয়ে ঘরে বউ ছেলে ফেলে রেখে আজও এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দীঘির মেলা অম্লান ও অটুট রয়েছে—যদিও জাঁকজমক অনেক কমেছে। আস্তিকদের মতে আমরা দেবতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি না, রথ বেরিয়ে গেছে ঠাকুর নাই। তাই পুণ্যার্থীর সংখ্যা কম।

যাইহোক পুণ্যস্নান দীঘি, দীঘিই আছে।

কুমুদও এসেছিল। বউ ছেলেদের হাত ধরে, মাথায় মাছ ধরা পলুই ও ফুলের সাজি নিয়ে। বাপ ঠাকুরদাদার অভ্যেসটা ছেড়েও ছাড়তে

পারে নি যে! তাদের উদ্দেশ্য হোল রথও দেখবে, কলাও বেচবে।

হোলও ঠিক তাই। দক্ষিণা মানুষের পলুই দেখেই আষাঢ়ের সিঙ্গি মাগুর, কই মাছ ধরার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোমরে কাপড় তুলে কোচা-কাছা গুঁজে মাছ চাবার মত, পলুইগুলোকে লুটে নিল—। দরাদরি কোন ব্যাপার নাই।

রাম তাড়াতাড়ি বলল, আমি এটা ধরেছি'। কানু বলল আমি এটা সরিয়ে রেখেছি। মধু বলল যা শেষ। ভাই এর জন্য!—

ক'ঘণ্টার মধ্যে কিনে নিল, ভদ্র বড় বাড়ীর মেয়েরা। ফুলের সাজি-গুলি কুমুদের স্ত্রী ললিতার কাছ থেকে মুখের কথায় টাকা মিটিয়ে এবার তাদের বিক্রি ছেড়ে দরাদরি করে জিনিষ পত্র কেনবার পালা। তারা কিনল—উত্তরে যাত্রীদের দীঘি দেখার স্পেশাল সাক্ষী দু-ছড়া পাকা কাঁচকলা। একটা মাদুর, সরে গিয়ে খেলো গরম গরম তেলে ভাজা। ভেতর দিকে এগিয়ে আটআনার টিকেট কিনে দেখল সার্কাস। এক ঘণ্টার পর তারা কিনল গরম গুড়ের ঝিলিপি। খাওয়া শেষ, দিনমণিও তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

দূরের মানুষ, ঘরে ফেরার পথে। সামনের মানুষ আসতে লাইন দিয়েছে।

হঠাৎ কুমুদ একটি মেয়েকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না। মেয়েটি তার দিকে নজর করছে কিনা সে জানে না, সে কিন্তু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ললিতা বলল—বুড়ো বয়সে ধেঁড়ো সং, কেউ কিছু বলুক! কুমুদের এতক্ষণে দিশে হোল, বলল—না, কেউ কিছু বলবে না। বললে শুধু তুমিই বলবে। তবে তুমি যার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর—সেই, ঐ তোমার চোখের সামনে।

ললিতা বলল—কতদিন পর তাকে দেখেছো, সে নাওতো হতে পারে?

কুমুদ বলল, এতো শুধু চোখের দেখা নয়, মনের দেখাই যে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মন থেকে সেই দাগটা যে কোন রকমই মুছতে পারিনি কিনা!

ললিতা এদিক-ওদিক সরে সরে দেখে বলল, দূর! দূর! ভাই বোনদের মানুষ করতে গিয়ে সিঁথের মোছা সিঁদুর আর ঋষিয়ে নেয় নি, কি এমন ভাইবোন প্রীতি! কই দেখি, ললিতা এগিয়ে মায়ার সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দেখে মনে হয় সামনেই ঘর তোমার? আমরা এসেছি ঐ ওদিক থেকে। কিন্তু কোথায় কি বিক্রি হয় জানব কি করে? শুনেছি, টাকা থাকলে দীঘিতে কিছুরই অভাব নাই। আচ্ছা দিদি, ঝাঁটা পাই কোথায়? কুলোরও দরকার, সবচেয়ে দরকার একটা বঁটির। বলত, আমরা মেয়েছেলে দূর থেকে এসেছি, ওসব খুঁজে কি পাই! যে-সে মেলা! দীঘির মেলা, মানুষের চাপেই অস্থির! জিনিস কি খুঁজবো।

মায়া বলল, দু'হাত দূরে ঘর ঠিকই, কিন্তু আমরা অমন বাজারে মেয়ে নই—যে দিনরাত শুধু বাজার করি কিংবা বাজারে পড়ে থাকি।

ললিতা বলল, তা নয়, তা নয়। দেখছি সিঁথেয় সিঁদুর নাই, বউ হলে বলার কিছু ছিল না।

মায়া বলল, সিঁথেয় সিঁদুর থাকলেই বুঝি বউ? বাজারে মা ঠাকরুণরা সিঁদুর লেপে বাজারে নাম ঢাকবার জন্যে। বৌমাদেরত পরতেই হয়। তারপর মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, তোমার যা বাঁকা বাঁকা কথা, মনে হয় তিন সতীনের ঝগড়া। একজন ঝাঁটাধরবে, একজন ধরবে বঁটি আর একজন পিঠে কুলো বেঁধে মার আটকাবে।

কথা শেষ হতে না হতে কালু ও ছবি এসে হাজির হোল।

কালু মায়াকে কাঠের পুতুলটা দেখিয়ে বলল বড় দিদি, এটা ছোড়দি কিনেছে। আর আমার এইযে—বলে হাতে দুটো ছোট মার্বেল দেখাল।

মায়া জিজ্ঞাসা করল হ্যাঁরে, তোর দাদা কোথায় রইল?

ছবি হাত বাড়িয়ে দেখাল ঐ যে আসছে। চাঁদু এসে বলল দিদি এবার?

মায়া বলল আর কি, এবার চল। দেখত কখন এসেছিস, ছায়া একাটি কি যে ভাবছে তার ঠিক নাই।

কালু বলল দিদি, মিষ্টি।

মায়া বলল, কেন, ঐ তো যে যার ইচ্ছামত জিনিষ কিনেছিস। আবার মিষ্টি কি?

কালু বলল আমি যাব না, বলে সে গোঁ ভোরে দাঁড়িয়ে রইল।

মায়া চাঁদুকে বলল, শোন তুই ঝিলেপি কিনে গামছায় বাঁধ, এখানে কি খাবি, ঘরে গিয়ে ভাগ করে খাবি।

চাঁদু ঝিলেপি কিনতে ঢুকল। মায়া ও ছবি এগিয়ে গিয়ে বলল আয়রে?

কালু সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফুলতে ফুলতে বসে পড়ল।

ছবি হাঁকলো যাক আমরা তবে চলে যাই।

কালু কান্না জুড়ে দিল।

চাঁদু সেইমাত্র শাল পাতার ঠোঙায় মোড়া ঝিলেপির পোঁটলাটা কালুকে দেখিয়ে হাঁকল, এইযে আমরা তবে সব খেয়ে নিই ?

সঙ্গে সঙ্গে ছবি বলল দাদা দে আমাকে দে বলে হাত পেতে এগিয়ে এলো।

মায়া ধমক দিয়ে বলল, বদমাস কোথাকার ! মেয়েছেলে না হয়ে যদি বেটাছেলে হোত ! কেন, ঘরে খেলে বুঝি তাকে খাওয়া বলেনি ? হাঁড়ি-খেঁকো স্বভাব তবে আর কাকে বলে।

ছবি বলল, হুঁ দেখ কেমন গরম ! গরম !

মায়া বলল যাক তিনজনে তিনটে তবে গরম গরম বেগুনি কিনে নে, খেতে খেতে যাবি। ছবি পয়সা নিয়ে কালুকে হাঁকল, ভাই, আয় বেগুনি কিনব, তবে যে কালু উঠে এল।

ললিতা এপাশ-ওপাশ করে জিনিষের দাম করার ছলে মায়ার আচরণ লক্ষ্য করছিল। সরে এসে মায়াকে বলল কি ঘর চললে বুঝি ?

মায়া বলল, হ্যাঁ, বেলা গেল।

ললিতা হেসে বলল, ডাকলে নি যে ?

মায়াও হাসতে হাসতে বলল, আজ আমার ঘর গেলে যে আমাকে তোমার ভাগ ছাড়তে হবে—যা সব কেনা কাটার ধুম।

ললিতা বলল আচ্ছা, চল—আমিও তোমার পিছনে যাচ্ছি।

মায়া বলল, বেশতো এসো না।

॥ কুড়ি ॥

গোদাই এসে হাজির হোল। আজ তার চোখে চশমা, গায়ের পাঞ্জাবী আধময়লা। জায়গায়, জায়গায় কুঁচকে গেছে। পায়ের চটি ধুলোয় ধুলোয় চা-কোর খানেক পুরু, পান খেয়ে ঠোঁট লাল। পণ্ডিতী বকর বকর ভাবটা অন্যদিনের তুলনায় বেশী কম নয়। তবে তার ভদ্রতাটা মোটেই ধার করা নয়। বরং বনেদী ফর্সা চেহারার উপর কাটারির মত নাকটি যেই দেখবে, ভক্তি আসবে। কিন্তু সেই মুখ থেকে কারণ সুধার গন্ধ নাকে আসবে, অমনি মুখ বাঁকায় ! সেণ্টের গন্ধ—সবাই বলে এ-হে-হে অভক্তি রাজ।

কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। সোজা মায়ার দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, মায়া আছিস তো ··?

কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যাবার জন্য পিছিয়ে এলো। কিন্তু সিধু দেখতে পেয়ে সামনে এসে বলল, কাকু এমন সময় হঠাৎ?

গোদাই বলল, এই তো সিধু, আমাদের মত মানুষকে আজ আর কেউ পোছে না বলে তোমরা আমাদের নিয়ম কানুনগুলোও হারিয়েফেলেছো। জলের মধ্যে হাবু-ডুবু খেতে খেতে বাঁচার জন্য পায়ের তলায় কখনও মাটি খুঁজে দেখেছ? তখন তোমার কি আছে, কে আছে ভেবে দেখার অবকাশ থাকে? কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্থল না পেলেই শেষ। সেদিনের কথা মনে আছে? যখন নেড়া ভট্টাচার্য্য লোকজন নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকত, এগিয়ে এলেই জয় মা কালী বলে পাঁঠা বলি দিত।

সিধু বলল, সে আবার মনে নাই। প্রাণের ভয়ে নদী ঝাঁপিয়ে শরবনের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনি। খরিস গোখুরো সাপও ছিল তখন বন্ধু। নাহলে সাপে ছোবল মারল না? অথচ মানুষকে জাগাতে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করতে যাওয়ার জন্য মানুষ ছোবল মারবে কেন? এখন সেই সব ফণীধররা ফণীহীন হয়ে শুধু বিষ ঢেলে দিচ্ছে। কারণ ফোঁস করলে যে সবাই লাঠিতে খুঁচি মারবে। হায়রে মানুষ! শত্রু মিত্র চিনল না।

গোদাই বলল, তবে নেড়া ভট্টচার্য্যের বেটা, শীতল রায় আজ আমাদের সব নয়া মাথা। আসনে বসলে তবে বৈঠক আরম্ভ হয়। আর আমরা এখন পিছনের মানুষ। সামনে সব চোখ ধাঁধানো, রং করা ভদ্র সন্তানরা। বাঃ-বাঃ আজব দুনিয়া! ওরা জানে? **What is neighbour? Who is neighbour?** হো, হো, হো···।

গোদাই-এর গলা শুনে নবীনও ছুটে এল। কাকু, নেড়া ভট্টচার্য্য দাঁড়িয়ে তখন কথা বলে। মুরুব্বি লাঠি ঠুকে ঠুকে গালি বেয়ে পানের পিচ মুখে নিয়ে বাবা বাছা করে। কিন্তু যেদিন পকেটের ভারে ভার খেঁচ তো। ঝোড়াপেটো না হলে শেয়ালের হাঁস ধরা করে প্রতিহিংসায়···! শালা বলত, তোরা ছোট জাত। তোরা যেমন—তোদের দলওতো সেই রকম হবে। হুঁ, এখন নিজের বেটা?

গোদাই বলল—নবীন, মা কত কষ্ট করে রান্না করে। কিন্তু তার ভাগ্যে যে কড়াই খুন্তি চাটা ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

নবীন বলল, কাকু সবই বুঝলুম। কিন্তু এ-যে কেউ-ই স্বাদ পেল

না, কুকুরে হাঁড়ি মেরে দিলে।

গোদাই বলল, সাবাস নবীন! সাবাস! তুমিই দেখছি আমার শিষ্য তৈরি হয়েছ। দেখ, সেদিনের ছেঁড়া বেশ আজ পাঞ্জাবীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এতেও কলকে পাচ্ছে না। ওদের সব গিলে করা; আর আমার আধ-ময়লা, কোঁচ পড়ে গেছে। ওদের গায়ে মাথায় আতরের গন্ধে ভরপুর, আমাদের সেই বোটকা ঘাম গন্ধ। মুখের দৌড় মাইল-মাইল। রংবাজের ব্যাটারা সব এক এক রং বাজ। আর আমরা সাদা সিধে। বলি ঢেউ এর পর ঢেউ উঠুক, নিজের থেকেই পুকুর চল-চল, ছল, ছল করবে। বরং পিছন থেকে আরও জোরে বাতাস কিভাবে তোলা যায় তার চেষ্টা কর। এই হোল আপদ, ওদের ডেকে আনতে বললে, উঠতি পড়তি নেতা সাজার জন্য বেঁধে আনে। ধমকানি দিতে বললে, অষ্টাঙ্গ ফুলিয়ে আনে। তারপর হঠাৎ জোড় হাত করে বলল, মাগো আজ কত রং-এ রেঙেছিস তুই মা!

আবার আরম্ভ করল, ক'বছর হোল, দলের কর্মকর্তা থেকে বাদ। এখন শুনছি সদস্যপদও থাকছেনি। কিন্তু কেউ কি জানে, কেন আজ আমার এই দশা? দ্যাখ, মদ ছেড়ে গাঁজা ধরেছিলুম। তাকেও ছেড়ে চুরুট। ওঃ হো···হো—কেউ জানে না কেউ জানে না। What is neighbour, Who is neighbour? নবীনের দিকে তাকিয়ে বলল, ওরে নবীন, এ যে নেশা—একটা ছাড়ব বলে অপর একটা ধরা মানে, এক-এক, দুই। যাক, ভুলে বেশ আছি। কেন, নেশা করব না? বলি কেন নেশা করব না? সবাই বলত ছোট, আজও ছোট হয়েই রইলুম। দেখ না, কেউ বুঝল না। আমরা ছোট ছিলুম বলে ওরা হোল বড়। কিন্তু আসল বড় কারা দেখবি মরনের পর। হয়ত আমার নামে একটা দলীয় স্মৃতিস্তম্ভ হবে। হো-হো-হো। সাহিত্যিক, কবি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের বচনগুলো যে তবে লয় হয়ে যাবে? 'জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা মরনে কেন তারে তুমি দিতে এলে ফুল।'

সিধু সরে এসে বলল—কাকু, শুনলুম যাতে তোমার ঐ নেশা কমে তারই জন্য, দল তোমাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।

গোদাই বলল—সিধু একটু আগে কি বললুম। একটা নেশা ছাড়ব বলে আর একটা ধরলে একে একে দুই হয়। যার মানুষকে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসা যখন বেঘোরে মারাখাচ্ছিল—তখনই সংগঠন করলুম। সকলে বললে দোলো। মানুষের স্বার্থে যদি দল ই-করি তাতে কিছু

যায় আসে না। কিন্তু যদি প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমি বিদ্রোহী হই? কার স্বার্থে? মানুষেরই স্বার্থে নয়? তবে যে যা বলুক, আমার কাজ আমি করেছি। ধুনো দেবার লোক থাকলে দেখতিস, সারা ঘর মোহিত হতো। কিন্তু আমার যে লক্ষ্য শেষ পরিণতির।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, খুবই দুঃখিত, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলল, হ্যাঁরে ওদের মধ্য থেকে আমার, তোর মত একজনকে পাবনি? ওরে সূর্য উদয়ে পদ্ম বিকশিত হয়।

সূর্য সব সময়-ই আছে। দরকার পদ্মগাছের। বড় কর, দেখবি সেও বলবে—এযে হক্কের লড়াই। কিন্তু সামনে মায়াকে দেখে বলল, এই দেখ, কাকে কি কথা শোনাতে এসে, কাকে কি কথা শুনিয়ে দিলুম।

মায়া দাঁড়িয়ে হাঁ করে গোদাই এর দিকে তাকিয়ে রইল। গোটা গা ধুলোয় ভরা। গামছা হাতে জিজ্ঞাসা করল, কি জানি কাকে কি বলছ বুঝতে পারছি না।

গোদাই বলল, বলব আর কি—গোদাই মল্লিকের পাঠশালা এখন গেরস্থ খোকাবাবুদের সরকারী খোঁয়াড়। আউট, আমি একেবারে বোল্ড আউট। গোদাই-এর দৌলতে এটা হোল আর্ট ক্লাসের বুনিয়াদী।

মায়া বলল, তাই নাকি? তবে আর এর তার কাছে তোমাকে হাত পাততে হবেনি বল।

গোদাই বলল, হুঁ, হাত পাততে হবেনি ঠিকই, কিন্তু তোর চাঁদুর যেভাবে তার চাঁদ বদন দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে এবার মাথা পাততে হবে। ও স্কুল যায় না, রাস্তায় বেরিয়ে মুখ দেখাদেখি করে? শোন, ভাল কথা বলছি, পাঁচুর মেয়ের সঙ্গে ভাইটির বিয়ে দিয়ে কাঁধে জোয়াল তুলে দে। ছোকরার বড্ড দড়ি টান হয়েছে।

মায়া কোন কিছু না বলে সিধুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিচুমুখে নানান, চিন্তা করতে করতে তারও মন গোদাই-এর উপর বিরক্ত ভরে উঠল।

আজকাল সবাই জানে, গোদাই নেশায় টর হয়ে থাকে। কাকে কি কথা বলে, তবে ঠিক থাকে না। বেফাঁস কথা বলার জন্যই সে নেতৃত্ব স্থানীয় কোন ব্যাক্তি তো নয়ই, উপরন্তু সদস্যপদ থেকে বহিস্কার করে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। মায়া মনে মনে আশ্বস্থ হোল। মাতালে কিনা বলে।

বড় ভাই মাণিককে জানে। অবাধ্য, বড় অবাধ্য। কিন্তু মেজ ভাই

চাঁদু যে তার ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। একবার মন দুঃখে ভরে উঠল। পরক্ষণে রাগে গোটা গা জ্বালা করতে লাগল। আবার অভিমানে ভাবল ঘর থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়ে। মানুষেরই তো পরিবর্তন হয়। তবে সে তার ভাইদের কেন পরিবর্তন করতে পারবে না? তাদের জাতের কু-অভ্যাস-রাত নাই দিন নেই নেশা করা, মাতলামী করা। কিন্তু তার মেজ ভাই তো এখনও বিড়ি পর্যন্ত ধরেনি। মদের কি স্বাদ সে কখনও জিভে দিয়ে দেখেনি। গরমের দিনে তালতাড়ির জন্যে তাল গাছের দিকে নজর করেনি। তবে কি গোদাই-এর কথা সত্যই ভুল। কিন্তু সামনে বাবা, জগু মালিককে আসতে দেখেই তার মন যেন সব জানে অথচ ওসব কিছু জানে না মনে হোল। সে কি এক ভয়ে ভীত হয়ে সরে আসতে চাইলো। বাবাও কি তাকে চাঁদুর সম্বন্ধে সাবধান করতে এসেছে, না জানিয়ে দিতে এল রক্তের দোষ। যাক তাকে আর সরে আসতে হোল না। সামনে সিধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জগু আর না এগিয়ে, সেই রাস্তা ধরেই মানে মানে সরে পড়ল।

সামনেই একটা সোরগোল উঠল। ক'জন ছোকরা সাইকেল হাঁকিয়ে বলাবলি করতে করতে আসছিল ছাড়, মাতালের কথা ছাড়।

পরক্ষণেই তারা সিধুর কাছে পৌঁছাল। দুজন ছোকরা সাইকেল থেকে নেমে বলল, সিধুদা, মাতালটাকে পাড়ায় ঢুকতে দাও কেন? জ্বালিয়ে মারে যে। একটা কথাই জানে, তাকে নাকি মেনে চলি না। কিন্তু এখন তবু তো মাতলামীর কথা বলে। কিন্তু দু-দিন পর না উচ্চ-বাচ্চ করলে হয়। বাকী দুজন সাইকেল থেকে না নেমে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা সিধুদা গোদাই মল্লিকই বুঝি আমাদের এসবের জনক? আর আমরা বামুন কায়েত বলে কি দলের পোষ্যপুত্রও নই? না, না, এতো ভাল নয়। বাপ-ঠাকুরদাদারা কি করে গেছে না গেছে তা দেখতে যাব কেন? যুগের তালে তাল দিয়ে চলেছি। আর যদি বলি, হাতে গেঁজা খেলে যদি হাতে গন্ধ ছাড়ে, তবে আমাদের গেঁজা খেতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন? বলেই সাইকেলে উঠল। বলতে বলতে চললো এসোগো সবাই মিলে আজ মল্লিক বাবার মাহাত্ম্য নিয়ে কথা তুলব। কথাটা বলেই কেটে পড়ল।

॥ একুশ ॥

রায় কর্তা খগেন রায়ের কাজে যাচ্ছি, এই আছিলায় মায়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু আজ সে চাঁদুর পিছু নিল।

গরমের দিনে সকালে স্কুল। পাঁচু মালিকের মেয়ে গরু ছাগল মাঠে বেঁধে ঘর ফিরছিল। চাঁদু বই কাঁধে নিয়ে ঠিকানা মাথায় দাঁড়াল। পাঁচুর মেয়ে লতিকা হাসতে হাসতে বলল, তুমি তো শিব সাজনি, যে মাথায় গঙ্গা ধরতে হবে, এখন বিদ্যাদেবীকে মাথায় ধর না।

চাঁদু বলল, ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু কে তবে তোমার ঐ খোঁপাকাটা চুলের বিনুনী গুণবে? গরু, ছাগল বাঁধতে তো আসনি, তুমি বাহারে শাড়ীর রূপ দেখাতে বেরিয়েছ। নইলে সাত সকালে এমন গা দুলিয়ে, কোমর বাঁকিয়ে গিরগিটির মত ঘাড় নাড়—আ-হা-হা যমুনা যেন কুলু-কুলু করে বহে চলেছে। আচ্ছা, তুমি কি যমুনা? না যমুনার তীরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?

লতিকা কিছু না বলে নিচু মুখে হাসতে লাগল।

চাঁদু বলল, আচ্ছা কত ভোর ওঠো তুমি? এমন সাজাতো দু এক ঘণ্টার ব্যাপার নয়?

লতিকা বলল, কি জানি, কেউ যদি আমার বাহারের দাম দেয়, তবে আমার পয়সা তো, আমার আঁচলেই থাকবে। তারপর বলল, দেখ চারা দিয়েছিলুম, টোপ গিলেছে। খেলাই তো এখন—কি সেই পাঠশালা থেকে—হো-হো-হো।

চাঁদু বলল, হুঁ। তখন গোদাই মল্লিকের পাঠশালা ছিল, গোদার ভয়ে কেউ টু-শব্দ করতুম নি। কিন্তু এখন সরকারী মাষ্টার মহাশয়রা ছাত্র শাসন করতে পারুক আর নাই পারুক গণশাসক। আমরাও পেয়ে বসেছি। আগে বলত পাড়ার ছেলে, এখন বলে বাঘের দেখা—বুঝলে দিদিই হোল আপদ!

লতিকা বলল, হুঁ, দিদির নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হলে তফিল কর। একটু থেমে ভাঙ মন নিয়ে বলল—হ্যাঁ, ঘরে অমন ননদ, তার উপর খালি ট্যা…ক। শোন তোমাকে ঐ চোখ টেরিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতেই

হবে।

চাঁদু বলল, কেন যার ঘণ্টায় ঘণ্টায় শাড়ী বদলানো হয়, তার কি হাত খালি? তোমার বাবা হাসপাতালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, পকেটে প্রণামী পড়লেই—প্রণামী তো গোনা-গুনতি নয়। নইলে ঐ শাড়ী কিনে দেবে তোমার বাবা? না, কোন দোকানে পাওয়া যায় তাই জানে?

লতিকা বলল, বাবার তো বহুরূপী হলে চলবে নি। কিন্তু আমি জানি চকমকি পাথর না হলে আলো ঠিকরাবে নি। আরে যতক্ষণ চক্ চক্ করতে পারি, ঠিক তো? হি-হি-হি।

চাঁদু বলল, ও-তোমরা তবে শরতের শিশির বিন্দু, যে পড়লে ঝিকমিক কর। তারই···।

লতিকা আর না দাঁড়িয়ে, সরে এসে চাঁদুর হাত ধরে বলল, তোমার বুদ্ধির তারিফ করি সত্যি। বলে চাঁদুর মুখের উপর যেন মুখ দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, বাবা যে এখানে ওখানে ঘটক লাগাচ্ছে।

চাঁদু বলল, গতকাল গোদাই কাকু দিদির কানে তুলে গেছে।

লতিকা বলল, তবেই তো মুস্কিল!

চাঁদু বলল, না, না, এবার মুস্কিলের আসান। বর সাজলুম বলে!

লতিকা বলল, তবে? তবে? দেখ দেখি কার বলতে কার হাতে তুলে দেবে? সে কেমন হবে, তার কি ঠিক আছে? আর তু···মি···তো আমার জন্ম থেকে চেনা। এমনি কি কাক-পক্ষিও জানল না বিয়ে হয়ে যায়। কেউ দুঃখ পাবে বলে আমি সারাজীবন জ্বলে মরি আর কি!

চাঁদু বলল, তাদের টাকা আছে। সব বশ হয়ে যায়। শেষে অবশ্য রং চটতে শুরু হয়। কিন্তু তোমার কী আছে?

লতিকা বলল, কেন আমাদের আমরা আছি।

চাঁদু বলল, তাহলে বুক ফুলিয়ে ঠোঁটে রং মেখে পাঁচজনের দৃষ্টি কাড়তে নি। তোমার গর্বে বাবা-মা বুক ফুলিয়ে জামাই-এর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী হতো।

লতিকা বলল, তবে বাপ-মা কাঁদতে বসে কেন?

চাঁদু বলল, দিন কালের হাওয়া দেখে। যাক্ তুমি কি ভাল?

সঙ্গে সঙ্গে লতিকা বলল, তুমি সব বুঝেও অবুঝ কেন মাইরি! এ-যে চোখের নেশা, বল, তুমিই দূরে চলে যেতে পারবে? আর তুমি যা বলছ, সে তো শাস্ত্র।

চাঁদু চুপ।

মায়া বনের আড়ালে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সব দেখেছিল ও শুনেছিল। কিন্তু আর দেরি না করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে ফিরে চলল। আসতে আসতে বলল, ভাইটা সত্যিই বিবেচক। কিন্তু তাকে বিবেক কি জিনিস তা শেখানো হয়নি।

মুহূর্তের মধ্যে লতিকা ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ডাক পড়েছে—চলছি। তুমি তাড়াতাড়ি কিন্তু··· ।

সেদিনই মায়া সন্ধ্যায় কাঁচা কঞ্চি ধরেছিল। কিন্তু সিধুই চাঁদুকে রক্ষা করল, বলল—কেন ওকে মারিস? সারকুঁড়ে কখনও পদ্মফুল ফোটেনি। বয়স হয়েছে বিয়ে দিয়ে দে।

মায়া বলল, এত টাকা খরচ করা কি জলেই গেল?

সিধু বলল, সুফলই হয়েছে, নইলে এতদিন দিদি বলেও চিনত নি।

মায়া চোখের জল মুছতে মুছতে দুয়ারে উঠল। তারপর চাঁদুর বিয়ের ব্যবস্থা করে বিয়ে দিয়ে দিল।

নূতন বউ হয়ে লতিকা বেশ কাটাচ্ছিল। চাঁদু খাটত ও দিদির হাতে টাকা এনে দিয়ে দিত। কিন্তু চারমাস কেটেছে, হঠাৎ চাঁদুর মন-মেজাজ কেমন যেন বদলে গেল। এখন চাঁদু খাটে বটে, কিন্তু টাকা দেয় না।

মায়া প্রথম কিছু বলত না। ভাবতো ওদের হয়ত টাকার দরকার। যা আমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় ঘর ঢুকে দেখল, তারা হাঁড়ি, চাল, বঁটি, খুন্তি এনে শুধু ঘোষণা করতে বাকী, দিদি আমরা পথ দেখে নিয়েছি।

মায়া বলল, ওঃ সেইজন্য টাকার বেলা অষ্টরম্ভা দেখাচ্ছিলে? হ্যাঁ, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শ্বশুরের বাঁধা উপায়, আর তোদের ধরে কে! হ্যাঁরে শিক্ষা হলো—ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা যায়নি। দেখি আমি বেঁচে থাকতে পারি কিনা। কথাটা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মায়া।

॥ বাইশ ॥

বৈঠক অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে শীতল রায় জানত না। এটা তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। কারণ এই বৈঠকের পরে আরও একটা গোপন বৈঠক বসবে, তার পদোন্নতি বিষয়ে।

দুধ থেকে সর, সর থেকে ননী, তারপর ঘি। শীতলের আজ দলের নেতৃত্বের পরিক্রমাটা ঠিক এই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু বাধ সাধল গোদাই মল্লিক। দলছুট সে। বর্তমানে সে সকলের ছিঃ ছিঃ, থুতুর কারণ। মার দেয় না, তবে খিস্তি দিতে জিভে আটকায় না। সাপ দেখলে যেমন যে কেউ-ই শিউরে উঠে, তেমনি তার হাতে গড়া দলের সকলে তাকে চোখে দেখলে, কোন দিক দিয়ে পালাবে তার জন্য ভীত. ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

আজ গোদাই নেশায় চুর। কোন ফাঁকে সে ঢুকে পড়ল এবং বলল, কাক আজ ময়ূরের পালক গুঁজে জাতীয় পাখী সাজছে বলে শুনছি।

বৈঠক সবেমাত্র শুরু হতে চলেছে, কেউ-ই মুখ খুলল না। কিন্তু শীতল গা দুলিয়ে, চোখ পাকিয়ে এগিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে বলল, ছাতা চামড়ার হলেও মাথায় থাকে আর জুতো সোনায় মোড়া হলেও পায়েই থাকে। সালা, কেমন ছোট লোকের কারবার দেখ দেখি! সবাই চুপচাপ। শীতল হাঁকল, ওরে···ও···বাদল, তুই কি নূতন হয়েছিস? যাকে তাকে বৈঠকে ঢোকাস? পাড়ার কাকু বলে সাতখুন মাপ?

বাদল বেরিয়ে আসছিল কিন্তু সিধু তাকে চোখ মেরে ইশারা করে দিল, চুপ কর, বলার সময় বহে যায়নি।

গোদাই পানের পিচ ফেলে এগিয়ে এসে বলল, সব শেয়ালের এক রা। কিন্তু দিনের বেলায় কি হুয়া হুয়া করে? একটু থেমে বলল, শীতল রায় আজ আমার হাতে গড়া স্কুলে মাস্টারী গুছিয়ে নিয়ে ছাত্রদের মাস্টার —পাড়ার গণ্যমান্য লোক হয়েছে। কিন্তু বাবার তেজ্যপুত্র, হো-হো-হো। আজ আবার শুনছি আমাদের এই ওয়ার্ডের সেক্রেটারী হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বাবা শীতল, তোমার এত টাকার গরম হোল কি করে? রাতারাতি কল-পাইখানা, তারপর ফুটবল খেলা বাড়ী। মেঝেয় তাকালে আয়না লাগে না। ইট কেনবার পয়সা তো বাবা তোমার

ছিল না।

শ্বশুর!—হো-হো আজ দলছাড়া হয়ে শুধু কৃতকর্মের জন্য আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। শুনেছি অনেক কিছুই দেবে বলেছিল, এখন তার ভাঁড়ে মা ভবানী। হ্যাঁ লুকিয়ে মা দিতে পারে, কিন্তু তা হয়ে সাগরের কাছে গোষ্পদ। হ্যাঁ, বাবা হ্যাঁ, পাঁচজনকে পাঁক ঘাঁটিয়ে সাড়ে সাড়ে কইটি ধরে নিয়েছ বর্তমান দুনিয়ায় তুমিই বাঁচার মানুষ।

গোদাই কিন্তু নামল না। সে আরও এগিয়ে এল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইসব এটাই বোধহয় সমবেত সকলের কাছে আমার শেষ বক্তব্য। নির্বাচন এসে গেছে—যোগ্য প্রার্থীও দাঁড়িয়েছে। কি করে তাকে জয়-জয়কারের সঙ্গে জেতানো যায় তার জন্য আবার উঠে পড়ে লাগো। এককালে আমরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে কি প্রচার করব, বুথ করতে পারতাম না। আমাদের ওয়ার্ডের বর্তমান ভাগ্য বিধাতার বক্তব্য আমাদের সকলের অস্থিমজ্জায়—বিদ্যুতের আলো বাড়ী বাড়ী গেলে, কে কখন বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা যাবে তার ঠিক নাই। মাটির রাস্তা পাকা করা হলে, লরী নিয়ে ডাকাতীকরে নিয়ে যাবে—রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। এই যাদের উঁচু মন, তারা কি করে কাজ করতে পারে বা করেছে, সেটা আমাদের ওয়ার্ডের বাসিন্দারাই জানে। বোনেদের কাছেও হাস্যাস্পদ। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠল।

শীতল বোধ হয় তার বক্তৃতার ইতি টানতেই এগিয়ে এসেছিল কিন্তু পাঁচজনের হাততালি খেয়ে মুখটি চুন করে বসে পড়ল।

এদিকে গোদাই জোর কদমে গলা ছেড়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল। আজ শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র ওয়ার্ডের কথা ছাড়া সমগ্র দেশটার কথায় আসছি—ভাইসব, আবার স্মরণ করিয়ে দিই, আমরা শুধু বরযাত্রী, খাবার পাত্র পাত্রী নই।, কাজই আমাদের শ্রেয়। তাই বিদ্রোহ করাই আমাদের মূলমন্ত্র। রক্ত আছে শরীরে। মন পড়ে আছে কাজে, তাহা সম্পন্ন করার জন্য। বিবেক বুদ্ধি আছে ভাল খারাপের বিচার করবার জন্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি "একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন", কিন্তু তাঁর উক্তি আমরা ঠিক মাথায় নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছি না। আজ আমরা সহস্রজনই—এই হাত হয়ে বসে আছি, নয়ত হতে চলেছি। আমাদের উচিত মনকে একই সূত্রে বেঁধে হাত বিভিন্নমুখী করে দেশের কথা ভাবা। আবাক, শিক্ষক আজ

রাজনীতির মাপকাঠি, শ্রমিক তো তথৈবচ, কর্মীরাও না বলে না। স্মরণ করিয়ে দিই ভাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শত্রুসেনা তখন জার্মান অবরোধ করে রেখেছে—চাই নাইট্রিক অ্যাসিড।

হাবার তৈরী করেছেন এ্যামোনিয়া, আর সেই এ্যামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রিক অ্যাসিড করলেন বিজ্ঞানী ওসওয়াল্ড।

ভেবে দেখ ভাই, যদি ওসওয়াল্ড বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে সৈনিকের মনোভাব নিতেন, তবে কি নাইট্রিক অ্যাসিড উদ্ভাবন হতো? যা আজ বিশ্বের কাছে অফুরনীয় হয়ে রয়েছে। তাই শিক্ষকের ভূমিকা তুমি দেশ তৈরি কর, অর্থাৎ রাজনীতির মোহজাল কাটিয়ে ছাত্র গড়ে তোল। শ্রমিক, তুমি পরিশ্রম করে উৎপাদন অব্যাহত রাখ। আরো উৎপাদনের দিকে নজর দাও। কর্মী তুমি নূতন নূতন কর্মের দিক ভাব। বুদ্ধিজীবি তুমি নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন কর। স্বার্থরক্ষাতে, রাজনীতিকে আশ্রয় করে কুকুরো লড়াই কোর নি। আর যদি তোমরা হট্ টেম্পার শিক্ষক শীতল রায় হও তবে দেখবে ভুঁড়ি বাড়বে, অর্থ বাড়-বাড়ন্ত হবে। কিন্তু মা, বাবা চিনবে না, দেশ কি জানবে না। বাবা শীতল আজ তেজ্যপুত্র। আর তোমরা হবে দেশদ্রোহী। দীক্ষা নাও What is neighbour, who is neighbour. সঙ্গে সঙ্গে শীতল, উদয় চাটুয্যে, কানু ঘোষ, ফণি বোস ছুটে এল—মার শালাকে। কেমন neighbour-এর জ্ঞানদাতা দেখি। শালা আমাদের neighbrur-এর জনক রে।

গোদাই, সিধু, নবীন প্রভৃতির মাঝে পড়ে বলতে লাগল এঁ্যা-এঁ্যা।

এ-কি! এ-কি!

সকলে হো, হো করে উঠে সামাল দিতে লাগল।

ঠিক সেই সময় কালী মালিকের স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ঔষধের জন্য যাই-যাই করছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। মায়া এখন পেটের রুগী, যন্ত্রণা কাকে বলে তার কড়ায় গণ্ডায় শিক্ষা হয়ে রয়েছে। পাড়ার মধ্যে যখন তাকে একটু জল দেবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না—তখন কালীর হা-হুতাশ শুনে মায়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিপদের কথা না ভেবে যামিণীকে রিক্সায় তুলে নিয়ে হাসপাতাল চলল, গোটা গালে নোংরায় ভর্ত্তি, মনে হোল সে-ই বুঝি কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। সিধু ছুটে এল, মায়া ওরে মায়া, তুই যাস্‌নে। তোর যে পেটের রোগ যন্ত্রণায় কাতলা কাছাড় খেলে তোকে

কে দেখবে ?

সিধুর মা, মায়ার আপন পিসি—যমুনা তালে তাল দিয়ে বলল, দেখ না বাবা, যেই কানে শুনেছি, যামিনীকে বমি-পাইখানায় ধরেছে, সেই থেকেই ওর দুয়ারে হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু কাল করল ঐ মিনসে কালী ঠাকুরপো। কেন পাড়ায় ব্যাটা ছেলে নাই—অমন পেট গলা রুগীটাকে নিয়ে ওকেই যেতে হবে হাসপাতালে ?

তার কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠেছিল। তার আগে অনেকেই গু-এর গন্ধে থুথু করতে করতে পিছনের দিকে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যমুনা এগিয়ে গিয়ে সবাই এর কাছে হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগল, হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ—ওযে ওখানের ঐ পুরিয়া মোড়া ডাক্তারটা আমাদের বলল, পেট পচে একেবারে গলে গেছে।

মায়া বলল, আমি পেট পচা রোগে মরি দুঃখ নাই, কিন্তু যামিনী বউদি কেন মরবে।

শীতল রায়, বাগ বিতণ্ডা বাদ দিয়ে এসে বলল, কি—রুগীকে এতক্ষণে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? বলে এসেছি কখন, যে আমি পাঠিয়েছি, মুখের এই কথাটা বললে ডাক্তররা, মশাই, মশাই করে ভর্তি করে নেবে। এ্যাঁ, এ যে কলেরা রোগী ! দেখ দেখি, গোটা পাড়াটাকে না মাতিয়ে তুললে হয়।

মায়া বলল, বুঝলে বড়দা, তোমার মত কত দাদাকে বলতে শুনলুম এখুনি হাসপাতাল নিয়ে চলে যাও। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কাউকে আসতে দেখলুম নি।

শীতল বলল, আবার চোপা করিস কেন। নেহাত জরুরী মিটিং ছিল, তাই। না হলে একাই হাসপাতালে নিয়ে চলে যেতাম।

গোদাই মল্লিক আর থেমে থাকতে পারল না। বলল, দেখতে বিদ্যাসাগর কেমন কলেরা রুগী নিয়ে হাসপাতাল চলেছে। তবে উনি কলির বিদ্যাসাগর তো মৃত্যুতে ভয় না থাকলেও রুগীটাকে ছোঁয়ার ভয় আছে।

শীতল আবার তেড়ে এলো। মাতলামীর আর জায়গা পাওনি।

মায়া বলল, দেখ রুগীটাকে নিয়ে যেতে দাও। কানা ছেলে কি তার মায়ের কাছে খারাপ হয় ? সরে দাঁড়াও দেখি ও বাঁচে কিনা। বলেই মায়া যামিনীকে নিয়ে চলে গেল।

॥ তেইশ ॥

ছবির বিয়ে দেবার বয়স হোল, মায়া ভেবে অস্থির। যোগাযোগ আরম্ভ হয়ে গেছে। এদিকে বরপণের টাকার জন্য সে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল। গত বছর ভালই ধান পেয়েছে। এক ছটাকও বিক্রি করেনি। বোনের বিয়ে যেদিন ঠিক হবে, পরের দিন ধান বিক্রি করবে। যা তিল, সরষে হয়েছিল, তাই বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে।

জগু মাঝে মধ্যে এসে হাজির হয়। কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যায়।

মানুষের এখন নেশার খোরাক ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। আগে ছিল ধেনো মদ, তারপর তালতাড়ি তো বারোয়ারী। এখন হেঁড়ে নেশাখোরদের আসর মাতিয়ে রেখেছে।

গরমকালে অল্পবিস্তর শিক্ষিত বাঙালীরাও নেশায় নামে নিজেদের দোষ এড়ানোর জন্য ভদ্রকথায় গেঁয়ো ডাক্তারী আরম্ভ করে। বলে, তালতাড়ি নাকি শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। ক্ষিদে বাড়ায়, শরীর ভাল থাকে। তাই বাঙালীরা মেতেছে নেশায় নয় মেতেছে কথায়। যাহোক, কমলীর মদের বাজার খুবই ঠান্ডা। খাটুনীও নাই। জগু মেয়ের ঘরে মজুত ধান দেখেছে। অনেকদিন মেয়েকে চাইবার জন্য ইতস্ততঃ করেছে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। আজ অভাব চরমে উঠল। কি আর করে, অভাবে আবার স্বভাব নষ্ট—চলল মেয়ের ঘর। গিয়ে দেখল মায়া মাঠে গেছে। ছায়াও কাজে বের হয়ে গেছে। ছবি গরু ছাগল নিয়ে মাঠে গেছে। ঘরে আছে কালু কিন্তু মারবেল খেলার পঙ্গ পালে মেতে ঘরের কথা তার মনে নাই।

জগু গামছা কাঁধে মায়ার ঘরে উঠল।

তারপর ইতস্ততঃ এদিক ওদিক দেখতে লাগল। দুয়ারে ও নেমে চঙু মঙু করে চারদিক দেখতে লাগল। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না। কাজ ছেড়ে ঘর আসার সময় তখন কারও হয়নি। মুজরদের ভাত খাবার বেলাও বহে যায়নি। জগু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। পূর্বস্মৃতি তার মনে এলো।—হুঁ এটাই তার সংসার ছিল। স্ত্রী মারা গেল, আমারও ছন্নছাড়া দশা চরমে উঠল! তখন নেশায় চুর হয়ে

সাংসার ভাবিনি। ভেবেছিলুম ভাঁড়খানা, স্ত্রী ছিল পতিপরায়না। না খেয়ে স্বামীর ব্যবস্থা আগে—নেশা করলেও সাতখুন মাপ। আমি পেট ভরে খেয়েছি। নেশা করেছি—তারপর স্ত্রীর কাছে পাওনা ষোল আনা আদায় করে নিয়েছি। ভোগ তখন আমার ষোল কলায় পূর্ণ। কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরছে—হঠাৎ স্ত্রী বিয়োগ। সব দিক দিয়ে টনক নড়ল। খাবার কষ্ট, নেশা করা ডকে উঠল। তারপর—হুঁ্যা, হুঁ্যা জৈবিক নেশা আমাকে পাগল করে তুলল। তখন কিসের সংসার, কার সংসার ভেবে উঠতে পারলুম না। বোঝাবার মত মানুষও কেউ ছিল না। কে ছেলে, কে মেয়ে, তারা কি করছে পরেই বা তারা কি করবে সে সবের কোন চেতনা হোল না। নিজের চিন্তাই নিজে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ভোগ করব—ভোগের বস্তু থাকুক আর নাই থাকুক। তাই কামান্ধ হয়ে নিজের ভিটে ছেড়ে উঠলুম কমলীমাসের মদের ভাঁটিতে। সত্যিই আজ আমার ভাববার দিন।

নির্মম ইতিহাস! বড় মেয়ের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। ছোট ছেলে কালু তখন মাত্র মাস তিনেকের। মায়া মায়ের মত মানুষ করতে লাগল। নিজের জীবন যৌবনের সুখ জলাঞ্জলি দিল। মা বাপ হয়ে মেজ মেয়ের বিয়ে দিল! ভাইদের স্কুল পাঠাল। ছোট জাত কড়ার সংসারে সভ্যতার ফুল ফুটাল।

সময়ের তালে তাল দিয়ে সে আদিম বেশ-ভূষা, পেশা বদলে ফেলল। বের হোল চাষের কাজে। তার সৎ চারিত্রের জন্য জমিদার জমিভাগে দিতে কিন্তু করল না। লোভ তার এক, স্বার্থত্যাগ নিরানব্বই। তাই সে কোমরে কাপড় জড়াল, চুলেগামছা বেঁধে পুরুষের মতো কোদাল ধরল। নিজেই বীজ বুনতে লাগল। সার দিতে লাগল। বড় চিন্তা ছিল বোন বিদায়। তাই বোনেরা বড় হয়, সেও তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে বিয়ে দেয়।

কিন্তু সে সভ্যতার আলোকে আলোকিত হলেও, সমস্ত জাতীর মধ্যে তা প্রতিফলিত হতে পারেনি। তাই সেজ ভগ্নিপতি আদিম মনোভাবাপন্ন হয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে।

ছায়া খোর পোষাকের মামলা করেত গিয়েও ফিরে এসেছে। সে জানে, গতর থাকলে ডান হাত উঠবেই।

পাঁচটা ভদ্র বাড়ীতে কাজ করতে গিয়েছে। তাদের পরিবেশের গুণে, সে ভুলে গেছে ছোট জাত কড়া। চিনেছিল শিক্ষাকে।

তাই সে ভাইদের স্কুলে দিয়েছে। মনে তেজ তার প্রবল। তার সেই রোষাগ্নিতে কত পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবুও সে ফিরে তাকায় নি। সে জেনে নিয়েছিল পাঁচটা ভদ্রলোকের মত না হতে পারি কিন্তু ভাইদের মানুষ করতে পারব। সঙ্গে সঙ্গে তারও মনুষ্যত্বের ঠিকানা ঘটবে। কিন্তু মানুষ যা চায়, তা পায় না। যা চায় না তাই পায়। ফলও বিরূপ হয়েছে। ভাইয়েরা অপর জ্ঞাতীদের মতো বেপরোয়া নয়। বাপের মত নেশাখোর নয়। বিয়ে করে যে যার সংসার দেখে নিচ্ছে। বলেই জগৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল—মায়া এখন তার অন্তিম পর্যায়ে। ছবির বিয়ে—জগৎ আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সে-ই ওদের জন্মদাতা পিতা। পিতার কাজ যদি সে সামন্য মাত্র করত, তবে ভগবান বুঝি তাকে মাপ করত। তার বোধ হয় অভাব হোত না—আজ ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে মেয়ের কাছে দাঁড়িয়েছে। সুযোগ পেলে হয়ত চোরও সাজতে পারে।

অনুতাপে তার মন অস্থির হয়ে উঠল। ঘেন্নায় সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। সে কামান্ধ হয়ে আবার বিয়ে করে সংসারী হোল। আর তার মেয়ে যৌবনের ষোল কলায় পা দিয়েও কর্তব্যের খাতিরে চিনল না নিজ সুখ—জীবন, যৌবন। আমার ফেলে যাওয়া সংসারকে নিজের সংসার বলে কাঁধে তুলে নিল।

সে তার মেয়ে নয়—উপায়ী, বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন বড় ছেলে। জগৎ চোখ খুলে মেয়ের উপস্থিতি আশা করল। কিন্তু কেউ কোথাও নাই।

হঠাৎ চিঁ, চিঁ শব্দ কানে এলো। তাকিয়ে দেখে মাথার উপর তালগাছে সারাপাখিটা আধার এনে বাচ্চাদের মুখে দিচ্ছে। জগতের মন অনুশোচনায় ভরে উঠল—ইস! তার ছেলে দুটো, মেয়েটা গতকাল থেকে আধপেটা হয়ে রয়েছে। এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজী হোল না। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের গামছাটা কোমরে বাঁধল। তারপর ঘরের শিকল খুলে ছোট এক বস্তা ধান টেনে দুয়ারে বের করে মাথায় তুলতে যাবে, পিছন থেকে মায়া এসে পিঠে কষালো এক কিল!

জগৎ ধানের বস্তা ফেলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে পিঠে হাত বুলাতে লাগল।

মায়া চেঁচিয়ে উঠল, শেষে কিনা চুরি করে সাড়ে সাড়ে নিয়ে পালাচ্ছ! ছিঃ, ছিঃ! জগৎ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মায়া আবার ঝংকার দিয়ে বলল, তাই মেয়ের ঘর আসছ—মেয়ের ঘর। ভাগ্যিস নিজে ঘর করেছিলুম। তোমার হলে তো, আমাকে তাড়িয়ে তোমার বলে নূতনটাকে পুরানো করতে। বাবা!—উনি আমার বাবা!

দেখতে দেখতে ছায়াও এসে সেখানে হাজির হোল।

জগু লাঠি ঠেঙানো আধ মরা গোখরো সাপের মত ফোঁস করে ছায়াকে দেখিয়ে বলল, ও যা উপায় করে, অত ওর লাগবে কেন? ও তোর সংসারে দেবে কেন?

মায়া বলল, যদি মানুষ করতে ওকে, ওর উপায় ভোগ করতে। বেশ তো জিজ্ঞাসা করে দেখনা, তোমাকে দেয় নাকি? তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে ছায়া তোর উপায় বাবাকে দিবি, না সংসারে দিবি? পরক্ষণেই আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখাল ঐ দেখ কাকেও কিছু না বলে ধানের বস্তা মাথায় তুলতে গিয়েছিল। নেহাৎ আমি এসে পড়েছিলুম বলেই···। ছবির বিয়ের জন্য আমরাই আধপেটা খেয়ে থাকি, আর উনি কিনা···।

ছায়া বলল, তোমার প্রশ্রয়েই তো মাথায় উঠেছে।

কালু অনেকক্ষণ এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু দিদির হাতে মারের পাথরের মত উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এতক্ষণ এবার সে ও চেঁচিয়ে উঠল—সবাই বড়দির প্রশ্রয় দেওয়া। না হলে দিন দুপুরে ধান তুলে নিয়ে যাওয়ার সাহস পেল কি করে?

মায়া চেঁচিয়ে উঠল—তুই-ই খুব ভাল। ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলি এতক্ষণ?

জগু বলল—ঐ তো তোর শিক্ষা। দু ভাই বিয়ে করে আলাদা হোল। কি লাভ হোল তোর—? বোনটাও ঘাড়ে এসে পড়েছে।

মায়া বলল, ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলাও শক্তি দরকার। তারপর বলল, বুঝলে বাবা, সবই বরাত। ধনীর ধন থাকলেই কি দান করতে পারে? ছেলে মেয়ে থাকলেই কি বাবা তাদের নিয়ে সংসার করতে পারে না পিতৃত্ব দিতে পারে?

জগু বলল, বাবাকে দেখবিনি তো, তোকে কে দেখবে?

ছায়া বলল, জ্ঞান দিতে হবে না। যার সংসার, সে তার দেখে নেবে।

সঙ্গে সঙ্গে কালু হাঁকল—ওরে আমার জ্ঞান দা···তা···রে!

সেই নির্জন দুপুরে সামান্য চেঁচামেচিতে পাড়া ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে

এল। বউরা ফিস-ফিস করে বলতে লাগল—এ সংসার আর ভাল লাগেনি চলে গেছে যাক্। নিজের শান্তি ওদেররও শান্তিতে থাকতে দাও। তা-না করে সাড়ে সাড়ে জিনিষ নিয়ে পালানো! দেখ, করে আরও কত কি নিয়ে পালিয়েছে কিনা?

বুড়িরা চিৎকার করে উঠল, একশোবার। একবার চুরি করলে কি ধরা পড়ে? দুজন জিভ কেটে বলল, ছিঃ, ছিঃ চুরি কেন বলছিস। কিন্তু সিধু এসে বলে উঠল, চুরি নয়ত কি? বলি, চুরি নয়ত কি?

না বলে অপরের জিনিষে হাত।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে উঠল, একশোবার। এখনও চোর বলে যে ধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে দিইনি তাই ওর মহাভাগ্য ভাল।

সিধু আরও সরে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, গরুর দড়ি দেখ তো।

জগু কোন কিছু আর না বলে মুখ নিচু করে গামছা দিয়ে গা-মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে ভিটা থেকে নেমে গেল।

ছেলেগুলো এক সুর ধরে চেঁচিয়ে উঠল, এবার এলেই লাল ঘর।

॥ চব্বিশ ॥

বর জুটে এল, মায়াও ছবির বিয়ে দিয়ে দিল।

দু বোন, এক ভাই, এই তাদের সংসার। ঘরে দুধওলা গাই ও তার একটি বকনা বাছুর। চারটি ছাগল, এটা গোয়ালের মূলধন। নিজে পেট পচা রুগী। দুধভাত তার ডাক্তারী খাদ্য।

সকালের দুধ বিক্রি করে দেয়। ছায়ার বর্তমানে কারখানায় কাজ। ভাল রোজগার, যা আনে বেশ ভালভাবেই চালিয়ে নেয়। কিন্তু সংসারের খবর ছাড়া মায়ার হাতে কিছু দেয় না। চাঁদু দিদিগত প্রাণ। দিদি ছাড়া সে একদণ্ড সহ্য করতে পারে না।

বিয়ে জিনিষটা জীবনের পথে এগিয়ে যাবার নিশান। কিন্তু নিশানের রং দেয় ছোট বেলার নিজ নিজ দোষ গুণ। তাই নিজের দোষ নয়, হিসাবের। বউ ঘর ভাঙে এটা বাঙালী। নিষ্ঠুর সত্য কথা। কিন্তু আন্তর্জাতীক মানতে হবে। ছেলের হিসাবের ভুল। চাঁদু হিসাবকে অর্ধেক করে ভাগ করেছিল। কোমল মনে মায়ের স্নেহছায়া দেখেছিল

দিদির কোলে। অপর দিকে প্রেম বুঝে নিয়ে ছিল স্ত্রীর স্নেহভরা ভালবাসায়। তাই মায়া যখন যা খেত চাঁদু যে অবস্থায় থাকুক না কেন দিদির পাশে বসে দু-গাল অন্ততঃ খেতই। হাত অপরিষ্কার থাকলে মায়াই খাইয়ে দিত। হাঁড়ি চালাতে না পারলে দিদির হাঁড়ি তো আছে। ছায়া সব দেখত কিন্তু জীবন যুদ্ধে সেও কম বড় যোদ্ধা নয়। মা-এর কথা মনে পড়েনি। দিদির কোলেও তদারকীতে বড় হয়েছে। মা মারা যাবার পর, বাবা তাদের ত্যাগ করে আবার নূতন মাকে খুঁজে নিতে দেখেছে। দু-দাদাকে বিয়ে করে ভবিষ্যতে ভেবে পৃথক হতে দেখেছে। নিজের স্বামী জৈবিক তাড়নায়। ছোট হয়ে আবার বিয়ে করতে সে দেখেছে। এখন যৌবনের জ্বালা গ্রীষ্মের দাবদাহের মত সহ্য করতে করতে সারাদেহে আগুন জেলে যেন বলে বেড়াচ্ছে, না, না আমার গায়ে হাত দিও না, ঝলসে যাবে। দুঃখ তার একটাই। সবই জৈবিক ক্ষুধা। মনুষ্য ক্ষুধা কারও মধ্যে নাই। শেষে বুঝে নিয়েছে ওসব সময়ের টান—অসার। বাঁচাটাই সার। তাই সে দিদির মত দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে নারাজ।

সবেমাত্র বিয়ের কুড়ি দিন কেটেছে, ছবি ও তার স্বামী শম্ভু এসে হাজির হোল। জুয়া খেলার মত শেষ দান করে মায়া সমস্ত কিছু খুইয়ে ছবির বিয়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় নূতন জামাই শ্বশুর বাড়ি আসা অর্থ, মুখে হাসি, অন্তরে কান্না। কারণ জামাই জামা-কাপড় যা এনেছে তা তো ছিঁড়ে যাবেই বরং একটা আটপৌরে ও একটা তোলা জামা ও কাপড় নিয়ে তবে বের হবে। মেয়েও তাই।

তিন দিন কেটে গেল। ছায়া কাজে বের হবার সময় মায়াকে বলল, দিদি আমি তবে কাজে বের হই ?

মায়া বলল, বাজার ?

ছায়া বলল, কেন ছবি আছে, ওতো বাজার কিনে তবে জিনিষ এনে হাজির হোত।

ছবি মুচকি মুচকি হাসল।

মায়া বলল, তখন ও তোকে খাওয়াবে বলে বাজার যেত। আর এখন তুই ওকে খাওয়াবি বলে বাজার যাবি।

ছবি বলল, ঠিক আছে। না গো দিদি, আমার কাছে যা বাজার আছে হয়ে যাবে। আমরা আছি বলে মাছ পটল, এই তো ? যেমন তুমি গত পরশু এনেছিলে।

ছায়া বলল, বিয়ের ক-দিনের মধ্যেই দেখছি গিন্নী হয়ে গেছিস। আচ্ছা শাঁখা সিঁদুরই গিন্নী করে না তোরা গিন্নী হয়ে ছিস বলে গর্ব করিস বলতো ?

ছবি বলল, আমার মত যখন তুমি শাঁখা সিঁদুর পরেছিলে তখন তুমিও তাহলে রাতারাতি গিন্নী হয়ে গিয়েছিলে বল ?

ছায় বলল, দেখ কিছু মনে নাই। তবে মনে আছে—দিদির কাছে কখন আসব, কখন তাকে জিরিয়ে নিতে দেব···হ্যাঁ সেইজন্য ভগবান আমাকে দিদির কাছ ছাড়াটি হতে দিল না।

শম্ভু এসে বলল, দিদি সবই হিসাবের কড়ি। কথাটা শুনে মায়া শম্ভুর মুখের দিকে তাকাল মাত্র। অপর দিকে ছায়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

শম্ভু আবার আরম্ভ করল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এবার আর মায়া দাঁড়াল না। নিজেই বাজার যাবার জন্য ব্যাগ হাতে ছায়ার কাছে দাঁড়াল।

ছায়া বলল, শেষে তুমিই বুঝি বের হলে ?

মায়া বলল, দৌড়ে এসে আবার কেন কাজে যাবি, তাই বাজারটা আমি করে আনি। কিন্তু ছবি মায়ার দুঃখের কথাটা বুঝতে পেরেছিল। তার স্বামী শম্ভু যে কথাটা বলল, তাতে মায়ার দুঃখ পাওয়ারই কথা।

অর্থাৎ ভাইয়েরা পৃথক হোল তাকে দেখার মত কেউ-ই নাই। তার অসময়ে তাকে দেখবে কে ? মায়াও আজ দুঃখের দু-কূলে পা দিয়ে, বাজার বের হোল। সংসারে বাবা বৈরী ভাইয়েরা স্বার্থ চিন্তায় দিদি বলে চিনল না স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে সে। তুমি সার জিনিষটি বুঝে নাও। মায়ার জীবনে এমন এক মুহূর্তে তার স্বামীর কথা মনে এল কিন্তু দোষ কি তার ? সে কর্তব্যের খাতিরেই ভাই বোন করতে করতে স্বামীর সেবা করতে চেয়েছিল। কিন্তু কি হোল ? মায়া মুহূর্তের জন্য নীল আকাশের দিকে তাকাল—তারা কি অভিশপ্ত ? ছায়ারও ঐ দশা কেন ? যদি সে স্বামীর ঘর করত তবে কি সে স্বামীর কাছ থেকে যা তার পাওনা তা পেত না ? সতীন কি সত্যিই স্বামীর ভাগ দিতে চাইত না ? কেন সে অশান্তি এড়িয়ে স্বামী সুখকে বিসর্জন দিয়ে দিদির জীবনকে বেছে নিল। কিন্তু ছায়ার বোঝা উচিত—দিদি কর্তব্য করতে করতে দৈহিক জ্বালায় অস্থির। জৈবিক জ্বালা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

ছায়াও এখন যৌবন আগুনে জ্বল জ্বল করছে।

উপায় ও দিদির জন্য কর্তব্য ছাড়া সে কোন কিছুতে নাই। তার মধ্যে আজ স্বার্থচিন্তা ভালরকম দেখা দিয়েছে। যে স্বার্থচিন্তা থাকার জন্য মানুষ সব হারায়। আমার আমার করতে স্ত্রী স্বামী ও স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য কিছু জানতে চায় না। তারপর উভয়েই সন্তান। সন্তান করতে করতে শেষে তাও চিন্তা করার অবকাশ পায় না এবার মানসিক বিভ্রান্তি আরম্ভ হয়। সব পর করতে করতে এগিয়ে চলে পরপারের পথে। তখন স্বামী-স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সুখ সম্পদ কিছু নিয়ে থাকে না। তখনই মানুষ ভাবে সং সাজা তার শেষ হোল। আসলে সার বস্তু সে আদায় করতে পারল না।

বাজার নিয়ে পথে আসতে আসতে তার ভাবনার উত্তর খুঁজে পেল না। সে দু পা এগিয়ে আসে,—দাঁড়ায় আবার হাঁটা আরম্ভ করে। ছায়ার প্রতি তার কি করণীয় আছে ? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, সে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর চঙ্মঙ্ করে চারদিক তাকিয়ে ভাবলো, না, না, তার আর দেরি করা উচিত নয়। আজই, না, না, এখুণি ছায়াকে কথাটা শুনানো উচিত। বলেই যত তাড়াতাড়ি পারল ঘরে গিয়ে হাজির হোল। দেখল তাদের তিনজনের কথাবার্তা তখনও শেষ হয়নি। মায়া গিয়েই বলল, কিরে তোদের বুঝি মজলিস এখনও শেষ হয়নি ?

ছায়া বলল, আজ তো বৃহস্পতিবার, আমার ছুটি। তোমার কাছে ছল করলুম। তুমিই যদি বাজার বের হলে, তবে দিদি কি ভাল মন্দের জিনিষ আনে। বলে ওদের সঙ্গে খোস গল্পে মেতে গেলুম।

মায়া চোখ করে বলল, বেশ করেছ, এখন আমার কাছে এসো, বলেই ছবিকে বলল, ছবি—তুই মাছটা কেটে নুন-হলুদ মাখা। দেখ পেট পচে গেল নাকি ?

ছবি কিছু না বলে মাছ কাটতে বসল। মায়া চোখে মুখে বলে তো ফেলল, এখনও নাল মরেনি, কিন্তু যা মেয়ের মেয়ে সব, পানের পিচ কি···আ-হা-হা কালীঘাটের মা গঙ্গা ! দু-গালি বেয়ে উপচে পড়ছে। নিস, ভাল করে ধুয়ে নিস। বলে ঘরে ঢুকে গেল।

শম্ভুও উঠে দাঁড়াল।

ছায়া হাঁকলো—জামাই-এর মুখে উঠবে তো ?

শম্ভু বলল, বড়দি ওঠার রাস্তা করে দিয়েছে। ভক্তি করে খেলে··· বলতে বলতে উঠান ধরে নেমে গেল। ছায়াও ঘরে এসে ঢুকল।

মায়া নীচু মুখে বলল, দ্যাখ, ক-দিন থেকে একটা কথা তোকে বলব বলে সময় আর হয়ে উঠেনি। আজ ভাবল, মানা বলে জলস্পর্শই করব নি।

ছায়া বলল, কি কথা? কই বল, আমি শুনি। না হলে আমারও মুখে হাত উঠবে নি, ঘুমতেও পারব নি।

মায়া বলল, দেখ ওদের ননীগোপাল···

ছায়া মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল—ও, তবে তোমাকেও ঘায়েল করতে বাকী রাখে নি। শোন দিদি, ওর জমি-জমা, ভিটে-ভাটা, পুকুর সবই আছে। মা বাবাও আছে। ও আমাকে পছন্দ করে বিয়ে করলেও, ওর বাবা মার যদি পছন্দ না হই? কেন দিদি, একে ঐ রোগে আমি সকলের কাছে অস্পৃশ্য। তবে কি বসন্তের দাগ না দেখলে মানুষ বলবে না ওর বসন্ত হয়েছিল। দিদি তোর পায়ে পড়ি, ওকে তো বরপণ দিতে হবে। ঐ টাকাটা আমাকে দে, আমি ব্যাঙ্কে রেখে দিই। অসময়ে ভাঙিয়ে খাব।

মায়া আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছায়া সরে এসে বলল, বেশ ত দিদি, অতই যদি সন্দেহ, আমি কথা দিচ্ছি, সকলের মত আমিও আলাদা হয়েই খাব। তবে তোমারই কথা, আমি যৌবনে জ্বল জ্বল করছি। এই কটা দিন তোমারই কাছে কাটাব। তারপর তোমার মত ঘর করে সরে যাব।

মায়া বলল, আমার মত কাটাতে পারবি তো? ঘর ছাড়া কোথাও বের হবিনি? আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কোন কিছু করবি নি?

ছায়া বলল, দিদি বাড়ন্ত মুলো পাতাতেই চেনা যায়। তুমি তোমার বোনকে কি দেখছ? বলেই ছায়া এক মুহূর্ত দেরি না করে বললে, হ্যাঁ ওসব আমার আঁচলে বাঁধা। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

॥ পঁচিশ ॥

লোচন পণ্ডিতের নির্বাচনে জয়লাভ উপলক্ষে আজ বিজয় মিছিল। সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব। অগুণতি লোক, এবারই তারা বিরোধীদের হারিয়ে ওয়ার্ড অধিকার করেছে। বক্তৃতার জন্য মঞ্চও বাঁধা হয়েছে। বেলা নয়টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাল, সবুজ মাথাগুলো মুখের হুংকারে গগন ফাটাবার উপক্রম করতে লাগল। নবীন, সিধুও বাদ যায় না। ঘর থেকে টেনে এনে তাদের মাথায় লাল সবুজ আবীর দিয়ে নিজেদের অনুগামী করে নিয়েছে। দলে দলে মানুষ এসে হাজির হচ্ছে। দল-কর্তারা আগেই এসে মঞ্চের উপর চেয়ারে আসন নিয়েছেন। মঞ্চ সাজানো শেষ। মাইক লাগানও সারা। এবার বিভিন্ন শ্রেণীর বক্তা বক্তব্য রাখবেন। তারপর ওখান থেকে বিজয় মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে আসবে। শুধু তাই নয়, এখানে পার্টি অফিসের ভিত্তি স্থাপন করা হবে। তাই মেয়েরাও হাতে শাঁখ নিয়ে হাজির হয়েছে—কটা জিপও তৈরী।

শ্লোগানের শেষ নাই। দেশে কবি নাই থাকুক, শ্লোগানে, কবিতার ছড়াছড়ি।

এ যেন ভাবের ঘরে গোলক ধাঁধা। তারই মধ্যে যে-ই সকলে বলে উঠল রক্তে রাঙিয়েছি, তাই তো অধিকার করেছি। অর্থাৎ বক্তব্য রাখার পালা শুরু। কোথায় ছিল কে জানে গোদাই মল্লিক আধ-ময়লা কাপড়ের উপর ছেঁড়া পাঞ্জাবীটা পরে তীর বেগে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে সোজা গিয়ে হাজির হোল লাউড স্পিকারের কাছে। ফণি বোস একরকম হনুমানের মত লাফ দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয় আর কি! সঙ্গে সঙ্গে শীতল হাঁকল, নামিয়ে আন, নামিয়ে আন!

গোদাই বলল, না শীতল তোমাকে আজ আমি উত্তপ্ত করব না। আজ আমি আমাদের সম্বন্ধে বলব।

ফণি তার হাত ধরে দেখাল, ঐ দেখ ক্ষিতীশবাবু বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

গোদাই ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে বলল, ও ক্ষিতীশ! ওকে তো আমি হাত ধরে এনে দলে ভর্তি করেছিলুম। বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ মুখ বাঁকিয়ে সরে দাঁড়াল।

গোদাই বলল, হুঁ একে আমি দলছুট পথের গোদাই ; আর ও এখন পালের গোদা—সিগারেট ফোঁকা ভদ্রলোক। আর আমার মুখে সেণ্টের গন্ধ।

ফণি, মুখ বিকৃতি করে বলল, ওঃ !

গোদাই বলল, আঃ নেশাখোররা, সবাই নেশাই করে দেখে কি না ? যেমন ঐ যে, আ-হা-হা যে শ্লোগানটা দিলে বলেই—সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, আর একটিবার দাও না সত্যি। কি যেন রক্তে রাঙিয়ে···ছি। লাউড স্পিকার দেখে নেশা চটকে যাচ্ছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু বলি। ওঃ কতদিন তোমাদের ভালবাসতে সুযোগ পাই না। তোমরাও কি ভালবাস না ?

শীতল ছুটে এল, ফণী তুই সর, আমাকেই উঠতে হবে, বলে মঞ্চে উঠতে লাগল।

গোদাই চেঁচিয়ে উঠল—তোমরা কেউ প্যাট্রিয়ট নও, এতটুকু তোমাদের পেট্রিয়টিজম্ নাই···

লোচন পণ্ডিত সদ্য গাঁথা বিজয় মালা গলায় দুলিয়ে বলে উঠল, না, না ও কি বলে, বলতে দাও। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ও আজকের প্রধান বক্তা, দলের কর্ণধার ক্ষিতীশ অধিকারী কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় চেয়ারে গিয়ে ধপ করে বসে এমন এক ভেলকি করল যে বলার কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে গোদাই-এর সুপরিচিত, সুমিষ্ট গলা চারদিক দিয়ে বান ডাকিয়ে দিল। আমি বেশী কিছু বলব না। তবুও সমবেত সকলের সঙ্গে সিধু ও নবীনকে বলি, হ্যাঁ, দলের গোড়াপত্তন নিয়ে একদিন বলেছিলুম —যারা কত কষ্ট করে রান্না করে, তাদের ভাগ্যে যে কড়াই খুন্তি চাটা ছাড়া আর কিছু জোটে না।

তার উত্তরে নবীন তুমি বলেছিলে, না, না কাকু, কেউ-ই স্বাদ পেল না। কুকুর হাঁড়ি মেরে দিল। আজ দেখ, ওসব মিথ্যা। খিঁচুড়ি বটে, কিন্তু সেখানে চাল ডাল, আলু সব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। কারও স্বাতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় নাই। ধন্য লোচন সামন্ত, তুমি ধন্য ! তুমি গরীব ঘর থেকে শিক্ষক ; তাই তোমাকে সবাই বলে পণ্ডিত। হ্যাঁ, তোমার ঐ খেতাবের মূল্য দিয়ে শুধু বলছি, সিধু নবীন তোমাদের বলেছিলুম, সূর্য্য উদয়ে পদ্ম বিকশিত হয়। সূর্য্য সবসময়ই আছে, চাই পদ্মগাছের। তাকে বড় কর—বলবে সব হক্কের লড়াই। লোচন সামান্ত তুমি চেন ; চেনাও—**What is neighbour, Who is neighbour.**

আমি অভিমান ভরে অভিযোগ করতেই তোমাদের বিজয় মিছিলের মঞ্চে চোরের মত হাজির হয়েছিলুম। কিন্তু লোচনের কথায় আমি আজ খিঁচুড়ি, তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর। তাই দু হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছি। বলতে বলতে গোদাই লাউড স্পীকার মাটিতে ফেলে দিয়ে নেমে আসতে লাগল।

সভা স্থির। কারও মুখে কোন কথা নাই।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নেমে কি যে হোল সে-ই জানে। কিছুদূরে এগিয়ে বসে পড়ল। তারপর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল।

নবীন চেঁচিয়ে উঠল, রক্ত! দৌড়ে এস, কাকুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। সিধু হাঁকলো জিপে তোল, হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হোক। সকলে বলে উঠল, হ্যাঁ-হ্যাঁ।

কিন্তু গোদাই কোন রকমে রাজী হোল না। শুধু বলল, যদি এখানে এই অবস্থায় মরি, তবে আমার চেয়ে তোমরা এতবড় ভাগ্যবান নও। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে যুজতে হোল না। মুখ ফ্যাকাসে হতে হতে এক-সময় শরীর স্থির হয়ে গেল।

সভায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। সকলে বোবা, বিমূঢ়। এমন সময় দূর থেকে মায়ার তীব্র হাহাকার ভেসে এলো। 'যাঃ শেষ দেখাটা কপালে জুটলো না? দুঃসময়ে, বিপর্যয়ে বল, বুদ্ধি, ভরসা আর কার কাছ থেকে পাবো?'

ভিড় ঠেলে চাঁদু ছুটে গেল—। দিদি ঘরে চল।

॥ ছাব্বিশ ॥

গোদাই মল্লিকের মৃত্যুতে কে কতটুকু দুঃখ পেয়েছিল, বলা যায় না। কিন্তু মায়া চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। ক'দিন তার মুখে রুচি ছিল না। চোখে ঘুম ছিল না। পরম হিতৈষী, পরামর্শদাতা বলতে মায়া তাকেই মনে করতো। দিন যায়, গতর খাটায়, কিন্তু গোদাই-এর চিন্তা তাকে বারে বারে নাড়া দিত। কিছু তার ভাল লাগত না। এবং তখনই তার বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা হোত।

সেদিন হঠাৎ কি মনে হোল, কাজ ছেড়ে ঘরে চলে এলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখল, দূরে একটি মেয়ে দুটি ছেলের হাত ধরে নবীনকে কি

জিজ্ঞাসা করল। সে হাত বাড়িয়ে মায়ার ঘর নির্দেশ করল। এবং সেই নির্দেশমত মেয়েটি ছেলে দুটিকে নিয়ে উঠান বরাবর ঘরে এসে উঠল!

মায়া অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি উঠানে উঠে মায়ার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, কি গো দিদি, এখনও চিনতে পারলে নি?

মায়ার তবুও কোন নড়ন চড়ন বা মুখে রা ফুটল না।

শেষে মেয়েটি বলল, চিনতে পারনি তো? অত ভাবার কি আছে—আমি তো বাঘ, ভাল্লুক নই! তোমার দীঘির মেলার কথা মনে আছে?

এতক্ষণে মায়া সহজ হয়ে বলল, তাই তো ভাবছি, কোথায় তোমায় দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। বেশ, বেশ উপরে উঠে এসো, বলে মায়া মাদুর পেতে দিল।

ললিতা উপরে উঠে মায়াকে প্রণাম করল ও ছেলেদের বলল, সেই যে কতদিন থেকে জিদ ধরেছিলি বড়মার কাছে যাব, এই তোদের বড়মা। বড় কাজল, মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াকে ঝাপটে ধরল। ছোট সজল, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মায়াও অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে রইল।

মায়া বলল, দেখ—সেই তো যতটুকু সময়ের দেখা, ভাল করে কথা-বার্তার সময় হয়নি…।

ললিতা বলল, যারা আপন হয় চিনতে ক-মিনিট লাগে।

পশু জন্তুরা যদি গায়ের গন্ধ শুঁকে ধরতে পারে, তার বাচচা কিনা—তবে মানুষ প্রথম দেখেই কেন ধরতে পারবে না, এ-তার আপনজন। তারপর ললিতা হাসতে হাসতে বলল, কি দেখছ? দেখতো, এদের চিনতে পার কিনা?

মায়া বলল, চিনতে তো পেরেছি, কিন্তু…।

ললিতা বলল, ও দ্বিধা হচ্ছে? বেশ তো, কি মনে হয় আপন আত্মার কেউ আছে? বউ হতে, এখন না ঝি হয়ে রয়েছে।

মায়া বলল, দেখ তোমার ঐ বাঁকা কথা, আমার বড় বিরক্ত লাগে। দিঘীর মেলাতেও ঠিক এমন বাঁকা কথাই বলেছিলে।

ললিতা বলল, সবই তো বাঁকা, তাকে চাপ দিয়ে সোজা করতে হয়।

মায়া বলল, সবার বুঝি সমান নয়। তারপর আমি সবজান্তা নই।

ললিতা বলল, বউ হয়ে থাকলে একজনকে তো চিনতে। আপন করে গলায় কবচ করে রাখতে। দেখ না, তার সঙ্গে এদের কিছু মিল

নাই ? বলে ছেলেদের দেখাল।

মায়া বলল, আচ্ছা মুস্কিলের কথা তো ?

ললিতা বলল, স্বামীর ঘর কি দু-দিনও করনি ?

এতক্ষণে মায়ার দিশে হোল। সে একবার কাজলের দিকে, একবার ছোট ছেলের দিকে তাকায়। তারপর ললিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ও সংসারী শুনেছি। কিন্তু কে—কি জানব কি করে ? আমি তো জানি, সে জেনে নিয়েছে সাপও মরেছে, ডোবও বুজেছে। আমার ওটা ভাবা উচিত নয়। তবে মনে মনে করি, তারপর ভাবি কেন ? বলেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এবার ছেলেকে কোলে তুলে ললিতাকে দুয়ারের মাদুরে বসিয়ে জল দিল।

খবরটা চারদিকে রটে গেল। পাড়া-পরশিরা একে একে পরিচয় করতে এলো। তাই মায়ার ঘরে লোকের ছাড়ান নাই।

পিসি এসে আজ দুদিন খুঁটো গেড়েছে। সবকিছু বসে বসে শুনছে।

সিধুর যাতায়াত ক্ষণে ক্ষণে। সে বার বার ছায়ার কানে কামড়ে বলে যাচ্ছে সাবধান ! ঘর ছেড়ে বাহিরে যাসনে। যা তোর দিদি, ঐ মায়া, ওকে ভেলকি দেখিয়ে যথাসর্বস্ব বের করে নিয়ে যেতে কতক্ষণ।

মায়া এতদিন মরমে মরেছিল। আজ সে শরমে মরে রইল। যে কোন বাঙালীর অনুষ্ঠানে সিধুর স্ত্রী উমা ডেকে নিয়ে যায়, আগে তার সিঁথেয় সিঁদুর দেয়, তারপর নিজে সিঁথী রাঙায়। মায়া বারবারই নিষেধ করত, কিন্তু উমা শুনত না। সে শুধু একটা কথাই বলত, তোমার স্বামী তোমাকে ত্যাগ করে গেলেও তুমি তো তাকে ফেলতে পারনি। এখনও কত মেয়ে আছে, ভালবাসার প্রতিদানে জীবনে তাকে না পেয়ে আর দ্বিতীয় জনকে বিয়ে করেনি। কিন্তু মনে মনে তারই পায়ে জীবন সঁপে দিয়ে চির বিদায় নিল তবে !

মায়া শুনত, লক্ষ্মী মেয়ের মত শুনত। তারপর সেই উমার কাছ থেকে ছাড়া পেত, অমনি কাপড়ের খুঁটে করে সিঁদুর মুছে তবে ক্ষান্ত হোত। কি অভিমান ! কি রাগ, কি দুঃখ মুখে কিছুই বলতে পারত না ! মনে মনে রাগ হোত, মনে হত—সবাই স্বার্থপর। কারও স্বার্থের পান থেকে চূণ খসার যো নাই। কিসের সিঁদুর, কার সিঁদুর ?

দু-দিন কাটল। ললিতা বলল, দিদি শুনেছ, আমিও শ্বশুরের ভিটেয় বাস করতে পারিনি। সবই ভাগ্য, বুঝলে। বাপের ভিটেকেই শ্বশুরের ভিটে বলে মেনে নিয়েছি। তারপর বলল, যে বউ তার শ্বশুরের

ভিটেয় না মরতে পেল তার আবার কিসের স্বামী ভাগ্য। অমন ভাগ্য তো রাস্তায় গড়াগড়ি যায়।

মায়া হাসতে হাসতে বলল, শোন তবে—বাপের ভিটেয় মরলে সবাই বলে ভাগ্যবান।

ললিতা বলল, সে ভাগ্যও তো জুটল না। বাবার কেনা ভিটে, আমাকে দিয়েছে।

মায়াও বলল, আমারও রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়া ভাগ্য।

এটা তো বাপের ভিটে নয়—নিজের টাকায় কেনা। হাতে গড়া ভিটে।

ললিতা বলল, সে থাক স্বামীর ঘর করা তো স্ত্রীর পরম সৌভাগ্য।

মায়া বলল, শুনি তাই। কিন্তু জীবনে তো ঘটল না। তাই···।

ললিতা বলল, তুমি যদি ছেড়ে দাও।

মায়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

ললিতা বলল, তোমার কথা ও আমায় প্রায়ই বলত। রাতে শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে উঠতুম।

মায়া আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

ললিতা মায়ার হাত ধরে বলল, বিশ্বাস কর, তার জন্য কিন্তু আমার কোন ঈর্ষা ছিল না। আমি বরং রেগে গিয়ে বলতুম, অত বকবক করতে কে বলেছে। যাওনা, তাকে আনো গিয়ে। আমাদের তো কোন কিছুর অভাব নাই। সে ই বা অমন অভাবের মধ্যে কাটায় কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মায়া বলল, বোন—দেখছ তো আমারও কোনটির অভাব নাই।

ললিতা বলল, তোমার ঐ এক অভাবেই অভাব।

মায়া বলল, আমি আর কি করব, ভগবান যদি···।

ললিতা বলল, যদির কথা ছাড়। আর তোমাকে একা ফেলে যাব না। তারপর কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁরে তোরা দু ভাই তোর বড়মার একদিক ধরবি, আর আমি একদিক ধরব। কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাব।

মায়া বলল, বোন, তুমি তবুও আশীর্বাদ চাইছি, শ্মশানে যেন ঐ ভাবেই যাই। তবে কে···।

ললিতা বলল, আবার সেই হা-হুতাশ! আজ আর কিছু বলছি না। আজকের মধ্যে তৈরী হয়ে নাও, আগামীকালই আমরা রওনা হবো।

॥ সাতাশ ॥

সিধুর কথামত ছায়া ঘরের বাইরে বাহির হয়নি। আজ তিন দিন সে কাজ বন্ধ করে দিদির বশংবদ হয়ে ওদের মুখের উপর মুখ দিয়ে না বসে থাকলেও আড়াল থেকে সমস্ত কিছু শুনত। আজ কথা সেরে ললিতা ছেলেদের নিয়ে পিসতুতো ভাই সিধুর বাড়ীতে বেড়াতে গেল। তখন ছায়া মায়াকে বলল, কি দিদি গোপালগঞ্জ যাবার তবে বহুদিনের মন্তব্য ? আজকে বোনেদের কাছে সাচচা সাজছ যে। ও-সব কিছুই জানি না। আচ্ছা শুধু ছোট বোনের বিয়ের অপেক্ষায় ছিলে। কেন দিদি, তুমি চলে যেতে পারতে। আমি তো এখন উপায় করতে পারি। তুমি সেখান থেকে দেখতে আমি ছবির বিয়ে দিতে পেরেছি কিনা ?

মায়া বলল, সবেমাত্র পয়সার মুখ দেখেছিস তো, তাই কত কি দেখবি। ছি ! ছি !

এতদিনে এতটুকু চিনলি ? মনে হয় গোপালগঞ্জ কেন, কপালের দোষে গলায় এক গাছা দিই।

ছায়া বলল, কেন আমার কথাটা এমন কি খারাপ ?

মায়া বলল, এমনকি খারাপ কেন—বল সমস্তই খারাপ। শুধু খারাপ-ই নয়, কানে শোনাও পাপ ! কেন জ্বালাস হতভাগী, কেন জ্বালাস ! যে মেয়ে যৌবনে স্বামীর মুখ দেখতে পেল না, এখন সে যাবে স্বামীর কাছে স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতে ? দূর ! দূর ! গলায় দড়ি, কোঁচড়ে কড়ি।

ছায়া বলল, তবে কেন তুমি আমার বিয়ের কথা ননীগোপালের সঙ্গে পেড়েছিলে, যদি বলি ঐ জন্যই। তুমি বলে যাবে, আমি আমার শেষ কর্তব্য পালন করে দিয়ে এসেছি।

মায়া চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, শোন, পাথরকে পাথর দিয়ে না ঘষলে আগুন জ্বলে না। তুই এখন আমার মত পাথর হোস নি। যেদিন হোবি, সেদিন বুঝবি দিদি কি, আর তুই-ই বা কি !

॥ আঠাশ ॥

সকালে রোদ ছড়াতে না ছড়াতে ললিতা মায়াকে তাগাদা দিল, দিদি এখনও জামা কাপড় পরলে নি ? কিছু গোছ গাছ করলে নি ? বলি বের হবে কখন ?

মায়া বলল, সে এখনও অনেক সময়। খাওয়া-দাওয়া কর—তারপর যাবে তখন।

ললিতা বলল, না দিদি কিছু ভাল বুঝছি না। আমার দেরি দেখে সে না এসে হাজির হলে হয়। তিন দিনের মধ্যে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু আজ হচ্ছে চার দিন। কার সংসারের পুরুষের চিন্তা না হয় বল ?

মায়া বলল, হ্যাঁ বোন। তোমার আছে তাই চিন্তা আছে। আমাদের এই যে··· !

ললিতা বলল, কেন দিদি আমি তো তার জন্যই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মায়া বলল, বোন বলছি, কিন্তু তুমি আমার আপন সহোদরা নও—সতীন। আমার সিঁথে শূন্য করে তোমার সিঁথে রাঙিয়েছ। তোমার মন কাঁদলেও তার কি··· ? তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই··· ।

ললিতা বলল, সে যদি তোমাকে তাই ভাবতো, তবে আমাকে এভাবে তারই ছেলে নিয়ে এখানে তিনরাত কাটাতে দেখেও স্থির হয়ে থাকতে পারত না। আমাকে তবুও পর করতে পারে, কিন্তু ছেলে দুটো ? বলেই ললিতা কাজলকে বলল, চলরে তোর বড়মা আমাদের হবেনি বলছে।

কাজল বলল, না, মা আমি বড়মার কাছেই থাকব। দেখছ মা, ঐ যে কত বড় স্কুলটা, ওখানেই পড়ব। তুমি এলে মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে যাব।

ললিতা আর দেরী না করে কাপড় পরল। মায়া তার চুলে তেল দিয়ে মাথা বেঁধে দিল। সিঁথেয় সিঁদুর দিল ও পায়ে আলতা পরিয়ে দিল।

ললিতা বলল, তুমি যে আমার ছেলেদের নিজের ছেলে ভাব—তা আমি তোমার কথাতেই ধরেছি। বেশ তো, ছেলে আমার নয় তোমারই। আমার কাজল যদি তোমার মরণকালে মুখে জল দিতে পারে, ও সাত পুরুষের

মত তোমাকে তর্পণ করতে পারে, তবে আমিও কম আশীর্বাদ পাব না।' বলেই মায়াকে প্রণাম করল। দেখতে দেখতে দু ছেলেও প্রণাম করে দাঁড়াল।

কাজল বলল, মা আবার কবে আসব ?

ললিতা বলল, তোর বড়মাকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ এটা তোর বড় মার ঘর। জোর করে এক আধবার আসা যায় বার বার নয়।

কাজল বলল, বড়মা, বল তুমি কবে আনতে যাবে ? তারপর বলল তুমি আমাকে মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন ? বড়মা, আমি দুষ্টুমী করব না, এখানেই আমি পড়ব। সত্যি বলছি, আমাকে বকাবকি করতে হবে না।

মায়া বলল, তুমি ওখানেই পড় বাবা। আমি সময় মত তোমাকে আনতে যাব।

কাজল বলল, সময় মত কেন বড়মা, তুমি কালই যাবে আমি বাবাকে বলে রাখব।

মায়া বলল, তোমার বাবা মা তোমাকে আমার হাতে দেবে কেন বাবা ? এত ভাগ্য কি আমার ?

ললিতা বলল, দিদি রোদ বাড়ছে। তোমার ভাগ্য খারাপ নয়—মনে মনে এসব ভাবছ। বলেই ছেলেদের হাত ধরে দুয়ার থেকে নামতে লাগল। ছায়া আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারল না, ছোট ছেলেটার হাত ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু মায়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাদের পথ লক্ষ্য করে ঘরে পাথরের মত বসে রইল।

॥ উনত্রিশ ॥

গরমের দিন ; সোমবারের চেম্বার, ফিরছি বাড়ী থেকে। মাথায় চিন্তা, রোগী দেখা সেরে বেরুতে হবে সোজা কলকাতা। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশীই দেরী হয়েছে। চেম্বারে প্রায় এসেই পড়েছি ; মাধবদা হাঁকলো, চাঁদু ফিরে আয়—ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখি একটা রিক্সা আমার দিকে ঘুরছে। কোন রকমে চেম্বার খুলে ঢুকলাম। রিক্সাও এসে দাঁড়ালো। দুঃখের বিষয়, যে ঘরটায় আমি রুগী দেখতাম, ওটা দাওয়াখানা নয়, বেমারীখানা। সাইনবোর্ডে ভর্তি ; মাঝে মাঝে রং ও তারপিন তেলের গন্ধ। তার উপর আমি তো ইনজেকশনে নিরামিশ। কিন্তু মশার ইনজেকশন খেতে খেতে রুগীরা হেসে বলত—"এতগুলো কম্পাউণ্ডার না রেখে একটা রাখলেই তো হোত। আপনার প্রশ্নের তবু উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু এদের সাতসুরো প্রশ্নের আগেই মরে যাচ্ছি। রসিকরা হেসে বলত না, না, কপালে হাত চাপড়াচ্ছি।"

হাঁটুভোর জঞ্জাল, তার উপর আলো না থাকায়, মনে হতো অন্ধকূপ। যাইহোক মায়া মালিকও আজ ঢুকে টুলে বসে, আলো বাতাসহীন ঘরে দমবন্ধ হয়ে টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। আমাদের তিনজন—কেউ পাখা ধরল, কেউ জলের ঝাপটা দিতে লাগল চোখে মুখে। কেউবা ঔষধের ব্যবস্হা করতে করতেই রুগিনী যাই হোক মাথা তুলল।

আমি বললাম, কথা বলতে পারবেন ?

মায়া বলল, কেন যে মাথাটা ঘুরে গেল—বুঝিনি ! বলুন, আমি উত্তর দিচ্ছি।

আমি কাগজ পেন নিয়ে তার নাম, ধাম, পেশা, বর্তমান অতীতের কষ্টের সঙ্গে বাপ ঠাকুরদাদাদের নিয়ে ঠাকুরমা, দিদিমার রোগ বৃত্তান্ত নেবার জন্য জেরা আরম্ভ করলাম। ধীরে ধীরে বেশ ভাল ভাবেই সে জবাব দিল।

পরের সোমবার দেখি, তার ফি দেওয়া সার্থক—টুলে বসে হাসছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার আপনি হেঁটে যে ? ভাবলাম বাড়ী গিয়ে

দেখে আসতে হবে।

মায়া বলল, না পরের দিনই উঠে বসেছি। এখন-খাচ্ছি-দাচ্ছি মাঠ ঘাটও বের হচ্ছি।

বেশ! বলে সামান্য জিজ্ঞাসা করে ঔষধ দিলাম। পরিচয়ের সূত্র এইটুকুই! তারপর দেখতাম প্রত্যেক শনিবার নয়ত সোমবার ঠিক সন্ধ্যায় আসত, ঔষধ নিত, চলে যেত। ভাবতাম মেয়েটির কি দিনক্ষণ মাপা— ঠিক সন্ধ্যায়। মনে মনে ভক্তি এলো। অনেক বুঝতাম। গরীব মানুষ, রোগ সারাতে হবে, তবে খাটতে পারবে। সেও তথাস্তু…আমিও দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে বাঁধা পড়লাম। যাক্ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা আরও গভীর হতে লাগল। কিন্তু একটা জিনিষ কখনই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, আচ্ছা, আপনার ভাই আছে, বোন আছে, তারা সঙ্গে আসে আবার দেরী হলে খোঁজ করতে আসে। অথচ আপনার সিঁথেয় সিঁদুর নাই কেন ?

দিন যায় ; মনের মধ্যে চিন্তাটাও দাপাদাপী করে, কিন্তু সুযোগ হয়নি যে জিজ্ঞাসা করি। এই ভাবে দেড় বৎসর কেটে গেল। আমি মায়ার শূন্য সিঁথি দেখি আর ভাবি…। এখন সাইনবোর্ডের গুমটি থেকে উচ্ছেদের মুখে পড়ে নিজের বাসস্থান ও প্রেসে সোমবার দিন বসতে শুরু করেছি। তাই সে সোমবারটায় মায়া ত্রি-সন্ধ্যায় এসে বেঞ্চে বসল। ঠিক সেই সময়ই আমার মেজদা বাড়ী থেকে সাইকেল হাঁকিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমি আজ আর সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে বাকী রাখলাম না। রক্তপিপাসু বাঘের মত লাফ দিয়ে বললাম, মায়াদি একটা কথা বহুদিন থেকে জিজ্ঞাসা করব করব করে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আচ্ছা আপনার সিঁথেয় সিঁদুর নেই কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে মায়া আমাকে বলল—ভাই, যে সিঁদুর দিয়েছিল, সে-ই যখন তুলে নিল, তবে থাকবে কি করে ?

জিজ্ঞাসুমন স্থির হোল না। বললাম কি রকম ? মেজদাও তখন তার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে বলতে লাগল, আর আমি মনের মধ্যে পরের পর ঘটনাগুলো থিতিয়ে রাখতে লাগলাম। কিন্তু তার ভাই বোন এসে হাজির হওয়ায় সেদিন আর সে বাকীটুকু বলতে সময় পেল না।

ছায়া এসে বলল, এ্যাঁ, তুই বেরিয়ে এসেছিস কখন ? বাপরে! দেখা যে পেলুম, সেই ভাল। তারপর আমাদের দু-ভায়ের দিকে

তাকাল।

আমরা দু-ভাই লজ্জায় মরে যাই। যাই হোক সেদিন তার নিবৃত্তি। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। এখন সে স্বচ্ছন্দে বলে—ভাই, আর আমি বলি দিদি—মায়াদি। সে বলে যায়, আমিও মনে থিতিয়ে রাখি। এক এক সোমবারে এক এক অধ্যায়। এইভাবে এক সোমবার বললে, সতীন এলো নিয়ে যাবার জন্য। যাবও ভেবেছিলাম—কিন্তু শেষে স্বামীকে ক্ষমা করতে পারলাম না। বলতে কি ভাই—সে অনেক চিন্তা করেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কি রকম?

সে বলতে লাগল, গোদাই মল্লিক মানুষ মানুষ করতে করতে মানুষের অধিকার, তা থেকে দল তারপর ইজ্জত তা থেকে অভিযোগ করতে করতে মনুষ্যত্ব বিকাশ ঘটাতে গিয়ে সমস্ত কিছু ভুলে থাকার জন্য মদ ধরল। শেষে টি-বি হয়ে রক্ত উঠে মরল। অভিভাবক আমার অনেক আছে কিন্তু মাথার উপর ছিল ঐ মানুষটাই। আমার লাজ-লজ্জা, ভয় কিছু ছিল না। আমি মেয়ে কি পুরুষ কিছু বুঝতাম না। কাজ-ই আমার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ও থেকে রোগ, এখন ভাই তোমার কাছে এসে পড়েছি। তারপর একটু থেমে বলল, এখন ভয় হয়, সবই করলাম—কিন্তু সংসার দেখলাম বালির বাঁধ! এর উপর দেখ না বোনটাও এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, এখন তবে কি করবেন?

মায়াদি বলল—না, সে আমার স্বামী ঠিকই, কিন্তু সে জীবনের একটা অংশ। কিন্তু আমার নীতি, জীবনের সর্বত্র বিরাজমান। ইহ-জনম ও পরজনমের। আমি ছোট জাত বলে কি মানুষ হবার যোগ্য নই? না সে সুযোগ আসেনি? আমার মা ও গোদাই কাকু-ই আমার জীবনে বড় হবার অধিকারিণী, অধিকারি।

বললাম, তারপর?

সে বলল, কটা দিন চিন্তায় চিন্তায় কাটল। কিন্তু একদিন আবার সব ভুলে গেলাম, আমার স্বামী, সংসার, সুখের দিনগুলি। কিন্তু সেদিন হঠাৎ রান্না করতে করতে মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখি, কাজল জুতো পায়ে খট্ খট্ করে উঠান বেয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল আমার একেবারে পাশে। তারপর মাথায় হাত রেখে ঠেলা দিয়ে বলল—বড়মা ও বড়মা দেখ, দেখ কে এসেছে।

তাকিয়ে দেখি হ্যাঁ, আমার সেই স্বামী। সব ভুলে গিয়েছিলাম। সে

শরীরও নাই, কিন্তু মুখটা দেখে চিনে নিতে দেরি হোল না। বিস্ময় কটিয়ে বললাম, নীচে ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন—উপরে উঠে এসো। সে আমার মুখের দিকে ও উঠানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুয়ারে উঠল। মনে হোল সবই চেনা কিন্তু মুখটাই মনে পড়ছিল না। আমি মাথায় কাপড় টানলাম না। কিন্তু তার মুখে কোন কথা নাই। বুঝতে পারছি, আমি তাকে দেখেও কেন মাথায় কাপড় দিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে আসন বিছিয়ে দিলাম। সে কিন্তু বসবে কি, এবার আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে শুধু শরীর ও কাপড় চোপড়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কাজল তার হাত ধরে বলল, কই বাবা বসলে যে। বড়মা যে তোমার জন্য সরবৎ ধরে দিল—খাবে নি ?

এতক্ষণে তার মুখে বাক সরল। বলল, বেশ তো তুই খা আমি এই যে খাচ্ছি।

বুঝলাম, সেই গলা—কোন পরিবর্তন নাই। তবে সামনের দাঁতটা ভেঙে যাওয়ায় কথা ফুকলে পালিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—সব ভাল তো ?

উত্তর দিল, হুঁ।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, লতিকা সজল ওরা দুজন যে এলো না ? ওরাই বা কেমন আছে ?

এবার অনেকক্ষণ বাদে উত্তর দিল, সবাই ভাল আছে।

সরবৎ খাওয়া শেষ।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে বসতেই তাকে মৌরি দিয়ে পান সেজে দিলাম। পান খুলেই বলল—বা, তুমি দেখছি সব মনে রেখেছ। দেখ মৌরিই আমার মহাপ্রাণী। খাওয়ার পর না জিভে পড়লে মনে হয় কিছুই খাওয়া হয় নি। এই নিয়ে তোমার বোনের সঙ্গে এক একদিন কি কাণ্ডই না বেঁধে যেত। এখন দেখি সায়েস্তা হয়েছে। তারপর বলল, দেখ নেশা তো ছিল দুটি। গরমের দিনে তালতাড়ি আর আলেকালে খেতে যেতুম কালীর দোকানে হেঁড়ে। তাও তুমি মাত্র আটদিনের মধ্যে তুলে দিয়ে এসেছিলে। তারপর তোমার কথা মনে ভেবে আর ধরিনি। কতবার সে মরা পুড়োতে গিয়ে নেশা করার ভয়ে আগে ভাগে বাড়ীতে আত্মীয় আসবার ছুতো ধরে পালিয়ে এসেছি গোনা

যাবে না।

সারা বিকাল পিসীমার বাড়ী, এখান ওখান করে বেড়িয়ে ঘর ঢুকল সাতটা নাগাদ।

আমি তাড়াতাড়ী রান্না সেরে ফেলেছিলাম। খেতে বসে পলতা পাতার ডালনা পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, একি রাতেই তুমি পলতার ডালনা করে দিলে! ও, আমার এই রাতে তেতো খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়িয়েছে। কি বলব, পটল ফলুক আর নাই ফলুক সময় থেকে পটল আল ঘরে গোছ করে রাখি। ও বলে আমাকে দেখিয়ে রেখোনি, ঝগড়া করতে করতে কবে খেয়ে মরে যাব। তারপর হাসতে হাসতে বলে, দেখ মরে গেলে তোমার ভাগ্যে জেল জরিমানা দুই জুটবে। কারণ এটা তোমার শ্বশুর ঘর আর আমার বাপের ঘর। আমি বলি মরেই দেখ না, তোমার বাবা কেমন জরিমানা আদায় করে আর পুলিশ এনে হাতকড়া দেয়। সেও খিল খিল করে হেসে বলে মরেই যদি যাব, তবে তোমার মত আহাম্মুখটাকে দেখব কি করে?

মায়াদি বলল, আমিও আর হাসি সামলাতে পারলুম নি। কিন্তু দেখলাম, আমার মুখে হাসি দেখে মানুষটা হঠাৎ বোবা হয়ে গেল। ভাবতে দেরি হোল না—আমাকে অবহেলা করার আত্মশ্লাঘার জন্য পূর্ব অনুশোচনার জের। আমি আর ঠোঁট নাড়লাম না।

দুধ ধরে নিলাম। চেখে বলল, সবই মনে আছে দেখছি—সামান্য দুটো চিনি দিতে ভুলে যাওনা।

আগেই ঘরে তক্তার উপর বিছানা করে রেখে ছিলাম। মশা নাই, তথাপি মশারী খাঁটিয়ে দিয়েছি। কাচা মশারীর ভাঁজ তখনও মেলায় না। তারপর পায়ে গরম রসুন তেল করে মালিশ করতে দেখে বলল, কেন আর অত—সব কর। যাও খেয়ে শুয়ে পড়গে আবার আগামীকাল সকাল থেকে জ্বালাব।

এতক্ষণ আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে শুনছিলাম, এবার টেবিলের সামনে থেকে ষ্টেথোস্কোপটা পাশে সরিয়ে, টেবিল ঝুঁকে গালে হাত দিয়ে বসে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হুঁ, হলুদ সুতোর বন্ধন তো?

মায়াদিও হাসতে হাসতে বলল, তা যাই বল ভাই। বলে একটু চুপ করে রইল। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল—আমি কাজলের বাবাকে বললাম, তোমার জ্বালানো যদি সবই আমার শীতল হয় তবে ও জ্বালানো

আমার কাছে অমৃতের থেকেও আরও বেশী দামী। স্বর্গের চেয়ে আরও সুখ। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সারাদিনের হাঁটা চলার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন দুপুর থেকে কাজলের বায়না শুরু হোল—বড়মা আমার স্কুল বার বার কামাই হয় যে, তুমি বের হও তো? বাবা আমাকে কখন থেকে তোমাকে বের হবার জন্য বলছে। আমি তবুও ঘরের ভিতর বসে কত কি চিন্তায় মরছি। কানে গেল সে ডাকছে—কাজল, কই বের হোলি?

কাজল বলল, বাবা, বড়মা বের হই, বের হই, করতে করতে কি যে তার ভাবছে কোন ঠিক ঠিকানা নাই। তার ডাকা বন্ধ হয়ে গেল।

কাজল গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিল, বড়মা ও বড়মা, তুমি যাবে বলেই তো মা বাবাকে জোর করে পাঠাল—কই বের হও।

এতক্ষণে আমি পিছু কাটবার ছুতো পেলাম। কাজলের মুখে চুমো খেয়ে বললাম, তোমার মা কি আমাকে যাবার কোন দিনক্ষণ করে দিয়েছিল? কাউকে কিছু বলা নাই, তোমার মাসী ও মামারা ঘ···রে না···ই। যাব বললেই যাওয়া যায় না বাবা।

তোমার মাকে বলবে আমার জানা রইল এর পরের বার আমি যাব।

কাজল বলল বেশ, আমি তবে রইলুম। বাবা চলে যাক। ক-দিন বাদ এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আমাকে আরও সমস্যায় ফেলল। আমিও মাথা খাটিয়ে বললাম, বেশ তো বাবা, তুমি এবার বাবার সঙ্গে যাও। কেন স্কুল কামাই হবে। আমি বলছি যখন, যাবই। তোমারও তো ছুটি পড়ে যাবে। আমিও এদিকে কাজ সেরে রাখি।

কাজল বলল, না, না তা হবে না। মা সেখানে কত কাকে বলে রেখেছে। আর তুমি যাবে না বললেই আমি শুনব কেন?

এবার কাজলের বাবা বলল, হ্যাঁরে কাজল তোর বড়মা ঠিকই বলেছে —ক-দিন বাদ আবার আসব। দেখবে তখন আর না করতে পারবে না। দেখ না বাবা, আমাদের মতো তোর বড়-মায়ের তো কাজ আছে।

কিন্তু অল্পবয়সী ছেলে হলে কি হবে, ভগবান ওকে বোধশক্তি দিয়েছিল খুবই। সে বুঝেছিল, আমার মনের গোপন কথা। তাই বলল—বড়মা; গতবারও এভাবে তুমি পিছু কেটে কেটে মায়ের সঙ্গে যাও আমি কি তোমার ছেলে নই?

আমি বললাম, তুমি আমার ছেলে তো বটেই। কিন্তু মা তোমার দোষ করল কি বাবা। বলছি তো পরের বার আমি যাব।

কাজল আর দেরি না করে কিছুটা অভিমান নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এল। উনিও বলল, বেশ তবে ক-দিন বাদ-ই আসছি, তুমি কাজ কর্ম মিটিয়ে তৈরি থেকো।

এই তার তখনকারের শেষ কথা, আমিও ততক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। ধীরে ধীরে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করলাম। এবারও আমার দিকে কত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বেশী তাকিয়ে ছিল মাথা ও কাপড়ের দিকে। ও ধীরে ধীরে উঠান বেয়ে নামতে লাগল। আমিও সামান্য এগিয়ে দিয়ে এলাম।

ব্যস কিছুক্ষণের জন্যে মায়াদি চুপ করল। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের উপর গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু এবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হতেই দেখি দরজা দিয়ে আমার মা ঢুকছে—

বললাম বেটার উপর রাগ পড়ল মা ?

মা বলল, আমার রাগ পড়ুক বা না পড়ুক আমার উপর বেটার কেন রাগ থাকে ? তাই এই রাত্রিতেই না এসে পারলুম না বাবা। কিন্তু সামনে মায়াদি ও আরও একজন মায়াদির পাড়ার রুগীকে বসে থাকতে দেখে মা আর না কিছু বলে ভিতর ঘরটায় চলে গেল।

মায়াদি বলল, ওঃ উনি তোমার মা বুঝি ?

একটু হেসে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ। আমার গর্ভধারিণী মা চারুবালা।

মায়াদি বলল, ভাই শোনো ; ঘরের কাজ করি খাই—কিন্তু চিন্তায় চিন্তায় আমি দিনের দিন সলতে পাকানো হয়ে যাচ্ছি। ছায়া কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে পারে না। প্রায়ই বলে বসত, বেশ তো তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বল। সেদিনও বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, দ্যাখ, আমি আমার হিসাব শেষ করে এনেছি তবুও বলছি—যে যার দেখে নে, আমি আমার দেখে নেব। আমার মনে ছিল না, কাজল ও তার বাবা ক-দিন আগেই ঘুরে গেছে।

ছায়া আজ আবার ছোবল মারল—দিদি ও তুমি কতদিন থেকেই বলে আসছ, কিন্তু কাজের কাজ তো কিছু করছ না। বেশ তো গিয়ে যদি তুমি সুখী হতে পার, তাতে তো আমাদেরও সুখ। আর যাইহোক, তুমি ভাল থাক, এ দেখেই আমাদের আনন্দ।

মন্ত্র পড়া সাপের মত লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। ছায়া কিন্তু আমাকে চটাতে কম করল না। সে জানে এখানেই আমার দুর্বলতা। সেদিন আমি ঘরের মধ্যে জেগে বিছানায় পড়ে রইলাম। সিধুদা এসে হাজির হোল। ,ছায়া সন্ধ্যায় রান্না কর ছিল।

সিধুদা বলল, কিরে গণ্ডগোল মিটল ?

আমি ভাবলুম উঠে গিয়ে বলি—কিগো দাদা, কিসের গণ্ডগোল ? কিন্তু আমার উঠার আগেই ছায়া বলল, আর কেন বল—বিছানা ধরে পড়ে রয়েছে। আমি উঠব কি, বালিশে মুখ গুঁজে কান পেতে শুনতে লাগলাম।

সিধুদা বলল, জানিস এটাই স্বামী স্ত্রীর আসল সম্বন্ধ। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে কি সোজা জিনিষ ? তাহলে বামুন মন্ত্র পড়তো না। বাবা মা দেখে শুনে বিয়ে দিত না। যাক্, গিয়ে যদি ও শান্তি পায়, পাক। হতভাগিটা তো জীবনে সুখ কি জিনিষতা জানল না। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি গুমরে কেঁদে উঠলাম। মনে হোল ছুটে গিয়ে বলি—পরের ধনে পোদ্দারী করতে আর জায়গা পাওনা। আমার পাওনাগণ্ডা সব ফেল, ফেলো বলছি। কিন্তু আমি কাজের মানুষ, সুখের চেয়ে কাজে দেখাতে চাই। তারা বলা কওয়া করে আর আমি চুপচাপ পড়ে পড়ে কাঁদি আর শুনি।

ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—দুঃখ যদি এত দিচ্ছ, সহ্য করার শক্তি দাও ঠাকুর। শুনতে পেলাম, ছায়া বলল, কত কে কত কি বলছে। কেউ বলছে শুধু বলা নয়, উদাহরণ দিচ্ছে—কুণ্ডুদের কচি স্বামীর সঙ্গে মামলা করল, শেষে খোর পোষ আদায় করে ভাই-এর সংসারে কর্তা সাজল। সমস্ত ক্যাশ তারই হাতে। তারপর জামাই সেই পথে ক'দিন আসতে না আসতেই মেয়ের সঙ্গে ইঙ্গিতে কথা বলে। সিনেমা দেখতে গিয়ে কচিকে হাত করে ফেললে। সত্যিই কচি ভাই, ভাইপো-ভাইঝি এমন কি আজ মরবে নয়ত আগামীকাল মরবে। এমন মায়ের কথাও চিন্তা না করে সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার ফাঁক কেটে পালিয়ে গেল। দেখ দাদা, দিদি অমন যে করবে না জানি। কিন্তু মানুষের মন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে সিধুদা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সাবধান খুব সাবধান! কথায় বলে—মণিনাশে মতিভ্রমঃ। তারপর বলল, শোন এসব গল্প নয়, মেয়েদেরই জন্য কত লোক একেবারে ফকির হয়ে যায়। কারণ এদের তো বাস্তব বুদ্ধি নাই—বড্ড কানভারী জাত—। আবার বলছি, সাবধান, খুব

সাবধান !

ছায়া বলল, এ-ও বটে। আবার উভয়ের ভবিষ্যত ভেবে এখন ওর হাতে আর আমি টাকা দিই না। আমিই রাখি।

সঙ্গে সঙ্গে সিধুদা বলল হঁ্যা। ভাগ্যিস তুই টাকার কথা মনে করলি। দেখ আমার যে পঁচিশটা টাকা না পেলেই নয়। অখিলকে দিতে হবে। ব্যাচারা পরীক্ষার ফি দিতে পারে না। দিলে যদি পরীক্ষায় বসতে পারে বসুক না।

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। উঠে গিয়ে বললাম, সিধুদা অখিলের পরীক্ষার ফি কবার লাগে ? সে কি ছাত্রনেতা হতে চলেছে ? আর তার জন্য আরও পাঁচজনের ফি দিয়ে দিয়ে নাম কিনছে। যেমন গোদাই কাকুর পর তুমি আমাদের মাথা হয়েছ। দেখো দাদা, উপায় করা পয়সা হলে তার মর্ম বুঝতে। কিন্তু ও যে মাগনা পয়সা ফন্দি ভাঁজায়, মুখ ছোটায়।

সঙ্গে সঙ্গে সিধুদা বলল, না, না ভুলে গেছি, ভুলে গেছি বই-এর টাকা আমি বললাম, সে পরীক্ষা দিক, পাস করুক তবে তো। এ-কেমন কথা রাম না রাজা হতে হতেই স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা।

ছায়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সিধুদার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এবং সেও আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল।

আমি এবার ছায়াকে বললাম, কাজের কাজ করত—বাজে কথায় কান দেবার দরকার নাই। নে ভাত বাড়, শুতে হবে। দৈনিক খেটে আনলে যাদের হাঁড়ি চড়ে, তাদের অত মুড়কি মিয়না কথা শোনা উচিত নয়। তারপর সিধুদার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের মতো নেতা চিনতে হলে আগে নোংরা মেয়েকে চিনতে হবে। দেখি ছায়া তখনও সিধুদার গা-ভাঙা, হাইভাঙার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমিই উঠে গিয়ে থালা ছোঁড়া ছুঁড়ি করে ভাত বাড়তে আরম্ভ করলাম। ডাক দিলাম, ভাত যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কিন্তু দেখি ছায়া আসন পেতে বসেছে।

পরের দিন কাজলের বাবা, অর্থাৎ আমার শুধুমাত্র আইবুড়ি নাম ঘোচানো স্বামী এসে আবার হাজির হোল। আজও আসন পেতে প্রণাম করলাম। তারপর জল, সরবৎ দিলাম।

দুপুরে ভাত খেতে বসে বলল, একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। আমি নাই এত দিন আসিনি—তাই তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নাই। পরণে

খাঁ, খাঁ, করছিল। কিন্তু আমিতো আবার এসেছি এবং আসবও জান, তবে কেন সেই বেশ ?

আমি নীচু মুখে বললাম, সিঁথেয় সিঁদুর নিলে তোমাকে কি অপমান করা হবে না। দেখি একেবারে চুপ। আর কোন কথা না বলে ভাত খেয়ে উঠল।

দুপুর গড়াতে না গড়াতেই বলল, কাজলের কথা মনে আছে ?— আমি কিন্তু আজই ঘর ফিরব। তারা ছাড়া ঘরে কেউ নাই।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বলতে যাচ্ছিলাম ছায়া কিংবা কালু কেউ-ই ঘরে নাই। কিন্তু ভাবলাম স্পষ্ট কথার কোন কষ্ট নাই—আর কোন ছুতো নয়। বললাম—দেখো, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারলেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বললাম, তোমাকে চিরদিন স্বামী-বলেই জেনে এসেছি তাই আমি এই অচলা মায়া। আমার কোনদিন কোন কিছুর পরিবর্তন লক্ষ্য করছ কি ? এভাবেই তুমি আসবে। তবেই জানব—আমি স্ত্রী হয়ে তোমার কাছে আমার প্রাপ্য রক্ষা করে চলেছি। ওদেরও সঙ্গে এনো। বলেই আমি ডুগরে কেঁদে উঠলাম। ও আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বললাম, তুমি স্বামী। তাছাড়া তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ। তাই বলছি, শাস্ত্র যদি মানা হয় হোক বাস্তব যদি হাসে হাসুক ; সমাজ যা বলে বলুক। তুমি আমার সিঁথি শূন্য করে যার সিঁথি ভরিয়েছ তার কথাটা একবার ভেবে দেখো।